প্রকাশক :
শ্রীরাজেন্দ্রকুমার গুপ্ত
'রাজেন্দ্র লাইব্রেরী'
১৩২, ক্যানিং স্ট্রীট (দ্বিতল)
[বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড]
কলিকাতা-১

প্রথম প্রকাশ
১৩৬৭ সাল

মুদ্রাকর :
শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ
'শ্রীহরি প্রেস'
১৩৫এ, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭

ভূমিকা

নাট্যকারের বক্তব্য হিসাবে কয়েকটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না আশা করি। এই নাটকের অর্ডার ছিল বছর দুই আগে থেকে। অর্ডার দিয়েছিল যাত্রার যশস্বী অভিনেতা পঞ্চু সেন। কিন্তু প্রত্যেকবারই পরস্পরের অবসরমাফিক যোগাযোগের অভাবে নাটক লেখাটা হ'য়ে ওঠে না। এবার লেখাটা হলো এবং ঠাকুরের কৃপায় বইয়েরও খুব সুনাম হ'য়েছে।

নাটকটিতে আমি একটি নতুন টেকনিক প্রবর্তন করেছি। মনের কথার মাধ্যম হিসাবে আমি মাইক ব্যবহার করেছি। যাঁদের টেপরেকর্ড করার সুবিধে আছে--তাঁরা গিরিশ-বিনোদিনীর মনের কথাগুলো টেপ্ ক'রে নেবেন। যাঁদের সে সুবিধে নেই, তাঁরা মাইকে বলবেন। যাঁরা তাও পারবেন না, তাঁরা আসরের কাছে এসে নেপথ্য থেকে চীৎকার করবেন। তাতে এফেক্ট একই হবে।

গিরিশের বৈচিত্র্যবহুল জীবনের মধ্যে এই নাটকটিকে "শ্রীরামকৃষ্ণ পর্ব" বলা যায়। এই নাটক লিখতে গিয়ে জীবন-চরিতের আশ্রয় তো গ্রহণ করেইছি, উপরন্তু বাগবাজারের প্রাচীন লোকজনের মুখে গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে যে-সব কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, সেগুলিরও সাহায্য নিয়েছি।

পরিশেষে ধন্যবাদ জানাই নিউ আর্য্য অপেরার স্বত্বাধিকারী শ্রীমান গোপাল-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে এবং ভক্ত-ভৈরব গিরিশচন্দ্রের প্রতিটি শিল্পীকে, যাঁদের প্রাণঢালা অভিনয়ে গিরিশ মূর্ত হ'য়ে উঠেছে। আশীর্বাদ করি সোদরোপম পঞ্চু সেনকে—যার চলায় বলায় ও সুকঠিন ভাবের অভিব্যক্তিতে এ যুগে নতুন ক'রে গিরিশচন্দ্র ঘোষ বেঁচে উঠেছেন।

সৌখীন নাট্য সংস্থাগুলি এই বই অভিনয় ক'রে যদি আনন্দ পান তবে শ্রম সার্থক জ্ঞান করবো।

বিধায়ক ভট্টাচার্য

চরিত্র-লিপি

—পুরুষ—

গিরিশচন্দ্র	...	নট ও নাট্যকার
ভৈরব	...	ভক্ত-ভৈরব
অতুল	...	নট
নবীন	...	ঐ
জীবন	...	ঐ
জুড়ন	...	ঐ
আতা	..	ভৃত্য
শম্ভু	...	ঐ
গোবর্দ্ধন বসু	...	গিরিশের প্রতিবেশী
দীনু ভট্‌চায্যি	...	মঠের ভট্‌চায্যি
নিতাই দাস	...	শিল্পী
ত্রিলোচন	...	মঠের সরকার
রামকৃষ্ণ	...	দক্ষিণেশ্বরের সাধক
বিবেকানন্দ	..	ঐ শিষ্য
রাখাল	...	ঐ
অভেদানন্দ	...	ঐ
মহেন্দ্র	...	ঐ
কালি	...	ঐ
রাম দত্ত	...	ঐ

গ্রেট-কীপার, ধর্মদাস সুর প্রভৃতি।

—স্ত্রী—

মহামায়া

বিনোদিনী	...	নটী
কালীতারা	...	ঐ

প্রথম অংক

প্রথম দৃশ্য

বোসপাড়া লেন।

সেক্সপীয়ার আবৃত্তি করতে করতে গিরিশচন্দ্রের প্রবেশ।

(আবৃত্তিতে তিনি তন্ময়। ক্ষণে ক্ষণে মুখ-চোখের ভাব বদলাচ্ছে। হাত-পাও নাড়ছেন সেই অভিনয়ের আবেশে। আবৃত্তি চলছে ম্যাকবেথ থেকে।)

গিরিশচন্দ্র ॥ "আউট আউট ব্রীফ্ ক্যাণ্ডল্। লাইফ'স্ বাট্ এ ওয়াকিং শ্যাডো। ইট ইজ্ এ টেল টোল্ড বাই অ্যান ইডিয়ট, ফুল্ অফ্ সাউণ্ড অ্যাণ্ড ফ্যুরী, সিগ্নিফাইং নাথিং।"

(আবৃত্তি শেষ হলেও দেখা গেল তিনি নিজের মনেই "আউট আউট ব্রীফ্ ক্যাণ্ডল্" কথাটা নানারকম করে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলতে লাগলেন।)

প্রতিবেশী গোবর্দ্ধন বসুর প্রবেশ।

গোবর্দ্ধন ॥ (গিরিশকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে) কি হে গিরিশ, আজ থিয়েটার নেই ?

গিরিশচন্দ্র ॥ আজ্ঞে না। কোথায় গিয়েছিলেন ?

গোবর্দ্ধন ॥ এই একটু ঘুরে এলুম। রিটায়ার করেছি। আগে তবু আপিস যাওয়াটা ছিল। পরিশ্রম তাতেই হতো। এখন তো একেবারে বসে থাকা। তাই সকালে বিকেলে বেরিয়ে অন্নপূর্ণার ঘাট থেকে নিমতলার ঘাট পর্যন্ত গঙ্গার ধারের পথ ঘুরে আসি। বেড়ানোও হয়—আবার কি বলে গিয়ে, একসারসাইজও হয়।

গিরিশচন্দ্র ॥ হ্যাঁ—তা হয়।

গোবর্দ্ধন ॥ তোমার তো জয়-জয়কার হে। নাটক তো বেশ ভালই হচ্ছে ব'লে শুনেছি।

গিরিশচন্দ্র ॥ হ্যাঁ।

গোবর্দ্ধন ॥ কি ব্যাপার বাবা? কিছু যেন চিন্তা করছো ব'লে মনে হচ্ছে। (গিরিশ চেয়ে আছেন গোবর্দ্ধনের মুখের দিকে) কি ভাবছো বাবা?

গিরিশচন্দ্র ॥ (মনস্থির করলেন বলবেন ব'লে) ভাবছি এই দুনিয়াদারীর কথা।

গোবর্দ্ধন ॥ সেকি কথা গিরিশ। ওসব কথা এখন আমরা ভাববো। তুমি কেন ভাববে বাবা? সবে তোমার নাম-যশ আরম্ভ হয়েছে। এখন কতো দিন পড়ে রয়েছে। এরই মধ্যে—

গিরিশচন্দ্র ॥ সে কথাই ঠিক কাকাবাবু। কিন্তু ব্যাপারটা কি জানেন? মানুষের পরমায়ু হচ্ছে ওই টাকার মতো। পৃথিবীতে সকলেই আসে একটা ক'রে টাকার থলে নিয়ে। তার মধ্যে কারো থাকে দশ টাকা—কারো বিশ টাকা—আবার কেউ কেউ পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর-আশী টাকা নিয়েও আসে। কাকা, একটি ক'রে সূর্য ডোবে আর সেই টাকা একটি ক'রে খরচ হয়ে যায়।

গোবর্দ্ধন। আহা! বেশ বলেছ। কিন্তু এর আর উপায় কি আছে বলো বাবা।

গিরিশচন্দ্র। উপায় গুরু। গুরুই পারেন রক্ষা করতে—গুরুই পারেন এই ভবযন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করতে।

গোবর্দ্ধন ॥ বেশ তো বাবা। কতো লোক আছেন—যাঁরা—

গিরিশচন্দ্র ॥ না কাকা। 'গুরুব্রহ্মা' 'গুরুর্বিষ্ণু' বলে যাঁর পায়ে মাথা ঠেকাবো—তিনি পেশাদার গুরু হলে তো চলবে না।

াবর্দ্ধন ॥ (চুপ ক'রে কিছুক্ষণ গিরিশের মুখের দিকে তাকালেন) তুমি বিদ্বান, বুদ্ধিমান। পাড়ার গৌরব তুমি। গুরু হয়তো আসছেন বলেই এত মন চঞ্চল হয়েছে তোমার। আচ্ছা, আসি বাবা।　　[প্রস্থান।

রিশচন্দ্র ॥ (একটু চুপ করে থেকে নিজের মনেই বলতে শুরু করলেন)

জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই
কোথা হ'তে আসি, কোথা ভেসে যাই—
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি
কোথা যাই সদা ভাবিগো তাই।

গীত।

নেপথ্যে পুরুষ মূর্তি ॥ কে খেলায়, আমি খেলি বা কেন,
জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন,
এ কেমন ঘোর হবে নাকি ভোর,
অধীরে অধীরে যেমতি সমীর
অবিরাম গতি নিয়ত ধাই ॥

পুরুষ-মূর্তির প্রবেশ।

(পুরুষ-মূর্তির পরণে লাল ফতুয়া, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে মদের বোতল।)

পূর্ব-গীতাংশ।

ষ-মূর্তি ॥ কি কাজে এসেছি কি কাজে গেল,
কে জানে কেমন কি খেলা হল,
প্রবাহের বারি রহিতে কি পারি
যাই যাই কোথা কূল কি নাই।

করহে চেতন কে আছ চেতন,
কতদিনে আর ভাঙিবে স্বপন ;
যে আছো চেতন ঘুমায়ো না আর,
দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার ;
করো তমোনাশ হও হে প্রকাশ
তোমা বিনা আর নাহিক উপায়
তব পদে তাই শরণ চাই।

গিরিশচন্দ্র ॥ (গান শেষ হলো। গিরিশচন্দ্র এতক্ষণ তার দিকে চুপ ক চেয়ে দাড়িয়েছিলেন। এইবার বললেন) তুমি কে ?

ভৈরব ॥ আমি ভৈরব।

গিরিশচন্দ্র ॥ নাম কি তোমার ?

ভৈরব ॥ ভক্ত-ভৈরব।

গিরিশচন্দ্র ॥ (আবার একটুকাল তাকে দেখলেন) আমার গান তু শিখলে কোত্থেকে ?

ভৈরব ॥ কেন ? তোর গান কি মৌরসী পাট্টা করা নাকি ? তোর লে বইয়ের তো গান। সবাই গায়—আমিও গাই।

গিরিশচন্দ্র ॥ আর কি গান জানো ?

ভৈরব ॥ তোর সব গানই জানি রে।

গিরিশচন্দ্র ॥ স-ব গান ?

ভৈরব ॥ হ্যাঁ রে। তোর সব গান, সব কথা, সব ভাবনা-চিন্তে আ জানি রে।

গিরিশচন্দ্র ॥ আমার ভাবনার কথাও জানো ? আচ্ছা বলো দেখি, এখ আমার কি ভাবনা ?

ভৈরব ॥ ফুলের গাছ পেতে মালীর যে ভাবনা। খালি জলই দিচ্ছে—অ

জলই দিচ্ছে। কবে গাছে কুঁড়ি ধরবে, ফুল ফুটবে—এই ভাবনায় সে পাগল হয়ে আছে।

রিশচন্দ্র ॥ ঠিক, ভৈরব, ঠিক। কবে আমার মরা-গাছে ফুল ফুটবে—বলো তো ভৈরব ?

রব ॥ ওমা! মরা-গাছ হবে কেন রে? তোর যে গন্ধরাজের ঝাড়। ফুল ফুটলে রাজ্যিশুদ্ধ লোককে জানান দেবে। কিচ্ছু ভাবিসনে। কুঁড়ি এল ব'লে।

রিশচন্দ্র ॥ কি আশ্চর্য! তুমি দেখছি আমারই মতো কথা বলো।

রব ॥ তুই আর আমি কি আলাদা? আমি-ই তুই—তুই-ই আমি।

রিশচন্দ্র ॥ তাই বুঝি ?

রব ॥ নিশ্চয়। ভক্ত-ভৈরব আর গিরিশচন্দ্র এক। আমি যেদিন থেকে আর আসবো না—সেদিন দেখবি তুই নিজেই ভক্ত-ভৈরব গিরিশচন্দ্র হয়ে গেছিস।

রিশচন্দ্র ॥ (আবার তাকে কিছুক্ষণ দেখে বললেন) কি জানি ভৈরব। আজই তোমাকে প্রথম দেখলাম। কিন্তু মনে হচ্ছে, তুমি যেন আমার কতকালের পরিচিত। যেন জন্ম-জন্মান্তর ধ'রে আমার কাছে তোমার যাওয়া-আসা।

ব ॥ এই তো—এই তো—অনেক কাছাকাছি এসে পড়েছিস দেখছি।

শচন্দ্র ॥ তোমাকে একটা মনের কথা বলি ভৈরব। গুরুর জন্যে আমার মন বড় ছটফট করছে। আমি মহাপাপী। গুরু নইলে আমার এত পাপ কে ধারণ করবে বলতে পারো? কোথায় গেলে আমি গুরু পাব বলো তো ?

ব ॥ তুই গুরু খুঁজবি কেন রে? গুরুই তোকে খুঁজে বার করবে। তুই দেখতে পাচ্ছিস না—আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—তোর গুরু তোকে খুঁজছে। খ্যাপা যেমন ক'রে পরশমণি খোঁজে ঠিক তেমনি

ক'রে গুরু তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ওরে, এলো রে এলো—তে গুরু এলো ব'লে। চোখ মেলে এই পথের ধারে বসে থাক· তাহলেই তাকে দেখতে পাবি—চিনতেও পারবি। [প্রস্থা·

রামকৃষ্ণের প্রবেশ।

গিরিশচন্দ্র॥ (প্রস্থানোদ্যত। সম্মুখে রামকৃষ্ণকে দেখে থামলেন এবং অবা হয়ে নমস্কার করলেন) ইনিই তাহলে দক্ষিণেশ্বরের পরমহং· আজকাল খুব নামডাক। ভণ্ড ব'লে তো মনে হচ্ছে না। এব বাজিয়ে দেখি। (রামকৃষ্ণকে) মশায়, শুনলাম নাকি রাজহংস ?

রামকৃষ্ণ॥ (নমস্কার করে) ওগো, না গো। অত উঁচু কেলাসে উঠ· পারবুনি গো।

গিরিশচন্দ্র॥ উঁচু কেলাস ? তার মানে ?

রামকৃষ্ণ॥ উঁচু কেলাস লয় ? রাজহংস হ'লো গিয়ে যাকে ব'লে একেবা ফাস্টো কেলাস। সবাই আমাকে পরমহংস বলে গো।

গিরিশচন্দ্র॥ ওই হ'লো।

রামকৃষ্ণ॥ না—হ'লো না। আপুনি আমাকে আশীর্বাদ করো—আমি ে রাজহংস হ'তে পারি। (গিরিশকে ভাল করে দেখে) ও বাব তোমারও তো গরভো লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি গো। ভ্রূণ এসে পেটে।

গিরিশচন্দ্র॥ সেইজন্যেই একটি ভাল ধাত্রী খুঁজছি—যে আমাকে উদ্ধ করবে।

রামকৃষ্ণ॥ ওগো! কেউ কাউকে উদ্ধার করে না বাবা। নিজে থে চেষ্টা ক'রে উদ্ধার হ'তে হয়। আম পাকার মতো। ত্যাখো· মুকুল হলো, গুটি ধরলো, বড় হলো—গায়ে রং ধরলো, পাকলে আর যেই পাকলো—অমনি ত্যাখো গন্ধ এলো, সোয়াদ এ·

বয় এলো। ওই যে বলে না—বনত বনত বনি যাই, সেইরকম। (প্রস্থানোদ্যত)

গিরিশচন্দ্র ॥ (তাড়াতাড়ি গিয়ে পথ আটকালেন) যাবেন না। আমার কিছু কথার উত্তর দিয়ে যান।

রামকৃষ্ণ ॥ বলো না গো, বলো না। তুমি পণ্ডিত মানুষ, আমি মুখ্যু। কি শুধোবে শুধোও।

গিরিশচন্দ্র ॥ মনের মধ্যে অস্থির হয়ে ওঠে কেন ?

রামকৃষ্ণ ॥ বলি সমুদ্দুর অস্থির হয়ে ওঠে কখন ? না—চাঁদ উঠলে। তোমার মনটাও তো সমুদ্দুর। খুঁজে-পেতে ন্যাখো—তোমার মনের আকাশেও বোধ হয় চাঁদ উঠি-উঠি করছে।

গিরিশচন্দ্র ॥ অদ্ভুত আপনার কথা বলার ভঙ্গী। আপনি মুখ্যু ?

রামকৃষ্ণ ॥ পাঁড়-মুখ্যু গো, পাঁড়-মুখ্যু। মা বেটি আমাকে পেরথম ভাগের সেই 'ম'-এ আকারে 'মা' শিখিয়ে আর একটি কথাও শেখায়নি গো!

গিরিশচন্দ্র ॥ আপনাকে বলি—আমি একজন ভালো গুরু খুঁজছি।

রামকৃষ্ণ ॥ ওমা! গুরুর আবার ভালো মন্দ কি গো? গুরু—গুরু। তবে হ্যাঁ, তাই ব'লে কি তর তম নেই? তর তম আছে বৈকি! তাকে আবার গুরুভার বইতে হয় তো! তা খোঁজ না। খোঁজ আর মনে মনে বলো—খুঁজে খুঁজে নারি—যে পায় তারি। দেখবে—ঠিক পেয়ে যাবে।

গিরিশচন্দ্র ॥ কিন্তু তাঁকে চিনবো কেমন ক'রে ?

রামকৃষ্ণ ॥ শোন কথা! বলি চাতক পাখীকে জলের মেঘ কি চিনিয়ে দিতে হয়? সে ঠিক জানে—কোন্ মেঘে জল আছে; ঠিক তারই তলায় গিয়ে 'ফটিক জল' ব'লে চেঁচায়। তা বাবা, পথে দাঁড়িয়ে কি এসব কথা বলা যায়? একদিন এসো-না দক্ষিণেশ্বরে।

মা যদি বলায়—তবে সব বলবো। এখন তাহলে আসি বাবা! জয় মা! জয় মা! জয় মা! [প্রস্থান।

গিরিশচন্দ্র॥ কে ইনি? ইনি তো সামান্য মানুষ নন! আমার মনের কথাটিকে কেমন ক'রে সুন্দর গুছিয়ে ব'লে দিয়ে গেলেন। বড্ড ইচ্ছে করছে এঁর সঙ্গে যাই। বলরামের বাড়িতে শুনেছি ওঁর আড্ডা। যাব? না—থাক। লোকে কি ভাববে? ভাববে, মোদো মাতাল গিরিশ ঘোষের ধর্মে মতি হ'লো? না ডাকলে যাওয়া উচিত নয়। সে দক্ষিণেশ্বরেও না—বলরামের বাড়িতেও না।

ছুটতে ছুটতে রাখালের প্রবেশ।

রাখাল॥ ঠাকুর আপনাকে ডাকছেন।

গিরিশচন্দ্র॥ কে ঠাকুর?

রাখাল॥ যিনি এক্ষুনি আপনার সঙ্গে কথা ব'লে গেলেন—রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

গিরিশচন্দ্র॥ তিনি আমাকে ডাকছেন?

রাখাল॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

গিরিশচন্দ্র॥ কি বললেন? কখন বললেন?

রাখাল॥ ওই যে—বৈকুণ্ঠ সান্যাল মশায়ের বাড়িটা পার হয়েই ঠাকুর থমকে দাঁড়ালেন। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন,—রাখালে! ছুটে যা! গিয়ে ওকে ব'লে আয় যে বাঁশী যদি শুনে থাকে তবে লাজলজ্জা না ক'রে চলে আসুক। নইলে সেই ফুটো কলসী কাঁখে নিয়ে নদীর ধারে গিয়ে পরীক্ষে দিয়ে মরতে হবে।

গিরিশচন্দ্র॥ হুঁ! উনি তোমার কে হন?

রাখাল॥ আমার গুরু।

গিরিশচন্দ্র॥ হুঁ! তুমি গিয়ে তোমার গুরুকে ব'লো—যে, গিরিশ ঘোষ

ফুটো কলসী কাঁখে নিয়ে নদীর ধারে গিয়ে পরীক্ষে দেবে। কানা আর ঠসা মাল গিরিশের কাছে চলবে না। বুক পকেটে রাখবার—গিরিশ ঘোষ তাঁকে বাজিয়ে নেবে। তিনি যদি ভট্ ভট্ না ক'রে টং টং ক'রে বাজেন তবেই গিরিশ ঘোষ তাঁকে বুক পকেটে রাখবে। নইলে শুধু বুকনি আর রেলাতে নোটো গিরিশ ভোলে না। যাও—ব'লে দাও গে ঠাকুরকে—আমি যাবো না।

রাখাল ॥ কিন্তু কেন যাবেন না? আপনি রাগ করছেন কেন ঠাকুরের ওপর?

গিরিশচন্দ্র ॥ না বাবা। আমি তোমার ঠাকুরের ওপর রাগ করিনি। রাগ আমার নিজের ওপর। আমি ডাঙায় ব'সে চেয়ে আছি জলের দিকে। ভাবছি, সাঁতার জানি না—নামলেই ডুবে মরবো।

রাখাল ॥ কিছু মনে করবেন না। ঠাকুর যখন আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, তখন নিশ্চয়ই আপনি সাধারণ মানুষ নন। আমি আপনার চেয়ে বয়েসে ছোট। অপরাধ নেবেন না। বলুন তো আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কেউ বই পড়ে সাঁতার শিখতে পেরেছে কি? সাঁতার যদি আপনাকে শিখতে হয়, যদি অগাধ জলের আনন্দ পেতে হয়—তবে জলে আপনাকে নামতেই হবে। জলে নেমে হাবু-ডুবু খেয়ে জল খেয়ে নাস্তানাবুদ হয়ে সাঁতার যখন শিখবেন তখন দেখবেন, অতল জল আপনার শত্রু নয়—বন্ধু।

গিরিশচন্দ্র ॥ আরে! এই রামকৃষ্ণ পরমহংস কোম্পানীতে সবাই দেখছি—ভালো ভালো কথা বলে। কিন্তু কথায় গিরিশ ঘোষ টলবে না। সে নিজে কথা বেচার দোকানদার। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গিরিশের বাড়ি।

নবীন মিত্রের সংগে কথা বলতে বলতে অতুলের প্রবেশ।

অতুল ॥ দাদা সাহেবের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে চাকরি ছেড়ে দিক্—এ আমরা চাইনি। কিন্তু থিয়েটারের ডাক দাদার কাছে আরও বড় ডাক। তার প্রমাণ দেখ পর-পর কতগুলো বই কি ভাবে জনপ্রিয় হলো। ষ্টেজটাই দাদার জায়গা। যদি কিছু হবার হয়—ওই ষ্টেজ থেকেই হবে।

নবীন ॥ বৌঠানের কাছে শুনলাম—কয়েকদিন থেকে গুরু গুরু করে পাগল হয়ে গেছেন। ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েও নাকি চেঁচিয়ে উঠছেন।

অতুল ॥ ওটা হবেই নবীন। ঠিক আমাদের মতো বাঁধাধরা হিসেবকরা জীবন নয়তো দাদার : বাড়ি আসবার ঠিক নেই, খাওয়ার ঠিক নেই। তার ওপর মনে করো নেশা-টেশাও করেন—বয়েস তো হচ্ছে। মনে একটা গ্লানি আসা খুবই স্বাভাবিক। সেইজন্যেই হয়তো—

নবীন ॥ আমি বলেছিলাম যে, দেশে কতোই তো ভালো লোক আছেন—যাঁরা মন্ত্র দিয়ে থাকেন। তাঁদের কারো কাছে চলো না যাই বললেন,—না। গিরিশ ঘোষ 'গুরুর্বহ্মা' 'গুরুর্বিষ্ণু' ব'লে যার তার পায়ে মাথা ঠেকাতে পারবে না।

অতুল ॥ বটেই তো নবীন। দাদা তো আর সামান্য মানুষ নন। নাটকগুলো ছাখো না। কতো ভালো ভালো জ্ঞানের কথা আছে তাতে দেশের বিরাট বিরাট মনীষীরা পর্যন্ত মুক্তকণ্ঠে সুখ্যাতি করছেন।

নেপথ্যে গিরিশচন্দ্র ॥ অতুল! অতুল আছো?

অতুল ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। এই যে—আমি এই ঘরে।

গিরিশচন্দ্রের প্রবেশ।

গিরিশচন্দ্র ॥ নবীন, কতক্ষণ এসেছো ?

নবীন ॥ আজ্ঞে, এই কিছুক্ষণ।

গিরিশচন্দ্র ॥ অতুল, তুমি দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস সাধুর সম্বন্ধে কিছু জানো ?

অতুল ॥ আজ্ঞে না। তবে শুনেছি—উনি কামিনীকাঞ্চনত্যাগী সাধু। কয়েকজনকে নাকি দীক্ষাও দিয়েছেন। আমার দু' একজন উকিল বন্ধু গিয়েছিল। তারা তো এসে বললে—খুবই চমৎকার মানুষ। বেশ পাওয়ারফুল। কেন দাদা ? আপনি কিছু শুনেছেন নাকি ?

গিরিশচন্দ্র ॥ শুনিনি. চোখেই দেখেছি আজ।

অতুল ॥ চোখে দেখেছেন ? উনি যাচ্ছিলেন বুঝি এদিক দিয়ে ?

গিরিশচন্দ্র ॥ হ্যাঁ, শুনলাম প্রায়ই এই পথ দিয়ে বলরামবাবুর বাড়ি যান। আজ দেখা হ'লো।

অতুল ॥ কি রকম দেখলেন দাদা ?

গিরিশচন্দ্র ॥ সাধুদের তো বাইরেটা দেখে ভেতরটা বোঝা যায় না। মেক-আপ্ করা থাকে। তবে এঁর দেখলাম কোন মেক্-আপ্ নেই। একেবারে সাদা-মাটা মানুষ। সাধু ব'লে মনেই হয় না। কি জানি কেন, মানুষটিকে দেখে মন এত চঞ্চল হয়ে উঠলো। মনে হলো, ওঁর পেছনে পেছনে যাই—বলরামবাবুর বাড়ি।

নবীন ॥ গেলেই তো হ'তো। মন টেনেছে যখন—

অতুল ॥ গিয়ে না হয় দেখে আসতেন—কি করেন উনি বলরামবাবুর বাড়িতে গিয়ে।

গিরিশচন্দ্র ॥ হ্যাঁ, তা হ'তো। দেখে এলে হ'তো। কি জানি দেখা এস্তোক মনটা ভারী চঞ্চল হয়েছে। চিরকাল সাধু-মহান্তকে দেখতে পারি না। মনে হয়েছে ভগবানকে নিয়ে ওরা ব্যবসা করে। কিন্তু কোথায়

কি হয়েছে বুঝতে পারছি না। সেতারের তারে স্বর বাঁধা না থাকলে যেমন হয়—আমার মনের তারগুলোরও ঠিক একই অবস্থা হয়েছে। তারগুলো সব ঢিলে হয়ে আছে। একজন যন্ত্রী চাই—বুঝেছ অতুল? যে মনের ওই তারগুলোকে স্বরে বেঁধে দেবে—তাকেই বলবো গুরু।

নবীন ॥ আমি সামান্য মানুষ। আপনাদের ওসব ভালো ভালো কথা আমি সব সময় বুঝতে পারি না। তবে আপনার মুখ থেকেই শুনেছি দাদা—যে, ভগবানকে পাবার জন্য মন যখন জলে-ডোবা মানুষের মতো আলো আর হাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে—মনের ঠিক সেই রকম অবস্থা হ'লে তবে ভগবান দর্শন হয়। আজ দেখছি, গুরু পাবার জন্যে আপনার মনের সেই অবস্থা হয়েছে—আর কি তিনি আপনাকে দর্শন না দিয়ে থাকতে পারেন? আপনি দেখে নেবেন—তিনি এলেন ব'লে। যাই দাদা। [প্রস্থান।

অতুল ॥ দাদা, আপনি যদি বলেন তবে আমি দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরকে খবর দিয়ে আসতে পারি আপনার সঙ্গে বাড়িতে এসে দেখা করার জন্য।

গিরিশচন্দ্র ॥ (হা-হা ক'রে হেসে উঠলেন) অতুল! এ কি তুমি আমার থিয়েটারের কোন কর্মচারী পেয়েছো যে তাকে গিয়ে ব'লে আসবে বাড়িতে গিয়ে আমার সংগে দেখা করলে তার মাইনে বাড়বে? এ যে আগুন—ছাই-চাপা আগুন। তবে আমিও গিরিশ ঘোষ—মোদো মাতাল নোটো গিরিশ ঘোষ—না বাজিয়ে আমিও অচল মাল ঘরে তুলবো না।

অতুল ॥ কিছু মনে করবেন না দাদা। আপনার মুখে তাঁর বর্ণনা শুনলাম—তাতে কে যে কাকে বাজাচ্ছেন সেটাই তো বলা শক্ত।

গিরিশচন্দ্র ॥ বাঃ! বাঃ! বহুৎ আচ্ছা! ভারী সুন্দর বলেছো কথাটা। কে

যে কাকে বাজাচ্ছে সেটাই বলা শক্ত। আচ্ছা, যাও তুমি—বিশ্রাম করোগে। [অতুলের প্রস্থান।

গিরিশচন্দ্র ॥ (কি যেন ভাবতে থাকেন, তারপর নিজের মনে ব'লে ওঠেন)

কিন্তু নাম ধরো ভক্তাধীন
কায়মন প্রাণ অর্পণ করেছি রাঙা পায়
তথাপি যদ্যপি তুমি না বুঝ বেদনা
রণস্থলে দেবতা মণ্ডলে
উচ্চকণ্ঠে কবির প্রচার
নহ তুমি লজ্জা নিবারণ
নহ কভু ভক্তাধীন
নহে কেন কর হতমান ?
হলে কণ্ঠাগত প্রাণ—
কৃষ্ণনাম আর না আনিব মুখে। (প্রস্থানোদ্যত)

মহামায়ার প্রবেশ।

মহামায়া ॥ হ্যাগো, অভিমান হয়ে থাকে না হয় কৃষ্ণনাম নাই করলে—কৃষ্ণার নাম তো করতে পারো।

গিরিশচন্দ্র ॥ তার মানে ?

মহামায়া ॥ বলছি, শ্যাম নাম ছেড়ে দিয়ে শ্যামার নাম করো-না।

গিরিশচন্দ্র ॥ বাঃ ! কে তুমি মা ?

মহামায়া ॥ আমি মহামায়া।

গিরিশচন্দ্র ॥ সে তো তোমাকে দেখেই বুঝেছি। কোথায় থাকো ?

মহামায়া ॥ আমি ওই বড় রাস্তার ধারে বামুনদের বাড়িতে থাকি। হ্যাগো, তুমি বুঝি থিয়েটার করো ?

গিরিশচন্দ্র ॥ করি বৈকি !

মহামায়া ॥ মুখে চুণকালি মাখো ?

গিরিশচন্দ্র ॥ হ্যাঁ। তাও মাখি বৈকি !

মহামায়া ॥ একগাড়ি পাশ দেবে ?

গিরিশচন্দ্র ॥ তুমি থিয়েটার দেখবে ?

মহামায়া ॥ দূর ! আমি কেন ? আমি যে-বাড়িতে থাকি তারা দেখবে। বুড়ো কত্তা, গিন্নী, দুই ব্যাটা, তিন ব্যাটার বউ—আমি থিয়েটারের গান জানি। শুনবে ?

গিরিশচন্দ্র ॥ না না, এখন একদম সময় নেই।

মহামায়া ॥ শোনই না। ভাল লাগবে তোমার—

গীত।

মহামায়া ॥
ওমা কেমন মা তা কে জানে।
মা বলে মা ডাকছি কত
বাজে না মা তোর প্রাণে ?

গিরিশচন্দ্র ॥ কি আশ্চর্য। এ তো আমারই ব'য়ের গান !

মহামায়া ॥ তোমার ব'য়ের গান ব'লেই তো গাইলাম গো ! তা হ্যাঁগো, তুমি এতো আনমনা হয়ে আছো কেন ? আমার কোন কথাই যেন তুমি শুনতে পাচ্ছো না। কি হয়েছে তোমার—অ্যা ?

গিরিশচন্দ্র ॥ না না, আমি শুনছি বৈকি ! ওই যে দুই ব্যাটা, তিন ব্যাটার বউ—

মহামায়া ॥ দুই ব্যাটার তিন ব্যাটার বউ ? দূর। দূর ! তুমি কিচ্ছু শোননি। কি ভাবছো ?

গিরিশচন্দ্র ॥ উঁ।

মহামায়া ॥ বলছি—কি ভাবছো এতো আনমনা হয়ে ?

গিরিশচন্দ্র ॥ ভাবছি গুরুর কথা।

মহামায়া ॥ ওমা! সে তো দেখলাম তোমার রকেই ব'সে আছে।

গিরিশচন্দ্র ॥ কে? কে ব'সে আছে আমার রকে?

মহামায়া ॥ কেন,—গুরু!

গিরিশচন্দ্র ॥ কোন্ গুরু?

মহামায়া ॥ ওই যে বোসেদের বাড়িতে থাকে। না—ঠিক থাকে না। ওই মাঝে মাঝে আসে—মাঝে মাঝে যায়। হুট্ ক'রে আসে—পুট্ ক'রে যায়। সে তো তোমার দরজার কাছেই ব'সে আছে।

গিরিশচন্দ্র ॥ কেন? কি চায় সে?

মহামায়া ॥ কি জানি? আমি তো শুধোলাম,—কি রে গুরু, এখানে ব'সে আছিস কেন? বললে,—থিয়েটার দেখবো! সে যাকগে—মরুকগে! তার গরজ হয়—সে নিজেই বলবে তোমাকে। তুমি বাপু আমায় একগাড়ি পাশ দিও। বুঝলে?

[প্রস্থান।

নেপথ্যে বিবেকানন্দ ॥ গিরিশবাবু! গিরিশবাবু আছেন নাকি?

গিরিশচন্দ্র ॥ আছি। কে? আসুন—ওপরে আসুন।

বিবেকানন্দের প্রবেশ।

গিরিশচন্দ্র ॥ কে আপনি?

বিবেকানন্দ ॥ পূর্বনাম—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত। গুরুদত্ত নাম—বিবেকানন্দ। গুরুর আদেশে আপনার কাছে এসেছি।

গিরিশচন্দ্র ॥ বলুন—

বিবেকানন্দ ॥ ঠাকুর বললেন,—উনি একদিন আপনার থিয়েটার দেখবেন।

গিরিশচন্দ্র ॥ (কেমন চমকে উঠলেন) যে আজ্ঞে। ঠাকুরকে বলবেন,—তাঁর যখন ইচ্ছে—যেদিন ইচ্ছে, তিনি যেন চলে আসেন—এলেই আমি সব ব্যবস্থা ক'রে দেবো। কিন্তু ঠাকুর থিয়েটার দেখবেন—

বিবেকানন্দ ॥ ক্ষতি কি ?

গিরিশচন্দ্র ॥ না—বলছি ষ্টেজটা তো ঠিক সাত্ত্বিক জায়গা নয়—আর ড্রামাগুলোও ঠিক ধর্মগ্রন্থ নয়।

বিবেকানন্দ ॥ আপনাদের সেক্সপীয়ার বলেছেন, "ওয়ার্ল্ড ইজ এ ষ্টেজ।" সেই ভব-রঙ্গমঞ্চে যে-সব নাটক নিত্যদিন অভিনীত হচ্ছে—তাই কি সাধু-সন্ন্যাসীর দেখার উপযুক্ত ? তবু তাঁদের আসতে হয় এবং অভিনয়ও করতে হয়। এই আপনার জীবন-নাট্যই ধরুন না। সেটা কি ধর্মীয় নাটক ? তবু স্বেচ্ছাচার আর ম্লেচ্ছাচারে ভর্তি সেই নাটকের নায়ককে ঠাকুর তো দর্শন দিলেন। শুধু দর্শনই দিলেন না, তাঁকে বলছেন,—থিয়েটার দেখবো।

গিরিশচন্দ্র ॥ অপূর্ব ! ঠাকুরের সব শিষ্যই কি এই রকম কথা বলতে পারেন ?

বিবেকানন্দ ॥ তা জানিনে। তবে যিনি মূককে বাচাল করেন, পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করান—তিনি ইচ্ছে করলে পারেন না কী ! আচ্ছা, চলি গিরিশবাবু। আপনার কথা ঠাকুরকে বলবো। নমস্কার ! [প্রস্থান।

গিরিশচন্দ্র ॥ (চেঁচিয়ে উঠলেন) অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটতে আরম্ভ করেছে ! সেই মেয়েটি, সেই মেয়েটি কোথায় গেল ? কি যেন নাম—হ্যাঁ, মহামায়া। মহামায়া ! মহামায়া ! (প্রস্থানোদ্যত)

আতার প্রবেশ।

আতা ॥ কাকে ডাকছেন ?

গিরিশচন্দ্র ॥ মহামায়াকে।

আতা ॥ সে আবার কে ?

গিরিশচন্দ্র ॥ আরে, এই যে সাধুর আগে আমার কাছে এসেছিল। বললে,—একগাড়ি পাশ চাই। আরো বললে,—গুরু এসে ব'সে আছেন থিয়েটার দেখবেন ব'লে।

আতা ॥ কার কথা বলছেন বুঝতে পারছি না তো!

গিরিশচন্দ্র ॥ কি বিপদ! এই যে একটু আগে আমার কাছে এসেছিল বললে,—বড় রাস্তার ধারে বামুনদের বাড়িতে থাকি।

আতা ॥ এই ঘরে এসেছিল?

গিরিশচন্দ্র ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ, এইমাত্র—মানে মিনিট দুয়েক আগে সে বেরিয়ে গেছে।

আতা ॥ না বাবু। মহামায়া ব'লে কোন মেয়েকে তো ওপরে উঠতে দেখিনি।

গিরিশচন্দ্র ॥ সেকি রে! সে এলো. গান গাইলো—

আতা ॥ গান গাইলো?

গিরিশচন্দ্র ॥ গাইলো বৈকি। আমারই লেখা গান।

আতা ॥ একটা মেয়ে গান গাইলো আর আমি সিঁড়ির নীচে ব'সে মশলা বাটছি—আমি শুনতে পেলাম না?

গিরিশচন্দ্র ॥ তুই যদি কানের মাথা খেয়ে থাকিস তো আমি কি করবো? একটু খুঁজে দেখ বাবা।

আতা ॥ যে মোটে আসেইনি—তাকে খুঁজবোটা কোথায়?

গিরিশচন্দ্র ॥ সেকি!

আতা ॥ হ্যাঁ। একমাত্র ওই সাধু ছাড়া আর কেউ ওপরে আসেনি বাবু। আপনি জেগে জেগে স্বপন দেখছেন। [প্রস্থান।

গিরিশচন্দ্র ॥ (কিছুক্ষণ চলে-যাওয়া আতার দিকে দেখলেন, তারপর হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠলেন) তোরা সবাই পাগল হয়ে গেলি নাকি? সে এসেছিল—সে আমার সঙ্গে কত কথা ব'লে গেল। আর তুই বলছিস,—আসেনি? (হঠাৎ চীৎকার) মহামায়া! মহামায়া! (হঠাৎ যেন বহুদূরে মেয়েলি হাসির খিলখিল ধ্বনি শোনা গেল) মহামায়া! (হঠাৎ থমকে গিয়ে) না-না—আতা ঠিকই বলেছে। হয় আমি স্বপ্ন দেখছি—নয় আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। ধীরে ধীরে পাগল হয়ে যাচ্ছি। [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

ঘোসপাড়া লেন।

জীবন রায় ও জুড়ন তালুকদারের প্রবেশ।

জীবন ॥ হ্যাঁ, বাবা—একথা না মেনে উপায় নেই। বাহাদুরী আছে লোকটার। দেশের ভালো ভালো ছেলেগুলোকে ধরে উড়কি ধানের মুড়কি খাইয়ে দিল।

জুড়ন ॥ কি রকম করে?

জীবন ॥ কানে ফুঁ দিয়ে। ফুঁ দিয়ে ব'লে দিলে,—যাও বাবারা—চরে খাওগে যাও।

জুড়ন ॥ তারা বেরোলো?

জীবন ॥ বেরোলো একেবারে ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নিয়ে। আমাদের পাড়ার দত্তবাড়ির নরেন ছোঁড়াটাকে ফুসমন্তর কানে দিয়ে ঠিক বাগিয়ে নিয়ে গেল। গিরিশ ঘোষকে বাগাবে এ আর বেশী কথা কি?

জুড়ন ॥ শুনেছি—গুটি-দশেক এ রকম কানে-ফুঁ-দেওয়া মাল—কাঁধে ঝুলি নিয়ে হরের মা—শংকরার মা ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

জীবন ॥ আর গুরুদেব পরমহংস বাবা পায়ের ওপর পা তুলে আরামসে ঘি-যি দিয়ে ফিনফিনে আতপ চাল সাঁটছেন।

জুড়ন ॥ এক কাজ করলে হয় না জীব্‌নে?

জীবন ॥ বল্‌।

জুড়ন ॥ এসব থিয়েটারে-ফিয়েটারে কিচ্ছু হবে না। আয়—আমরা মন্ত্র দেবার বিজনেস খুলি একটা। ও হলো দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস আর আমরা হবো সিমলেপাড়ার চরমহংস—অর্থাৎ, তার চেয়ে ওপরে।

জীবন ॥ বহুৎ আচ্ছা! জিও বেটা!

জুড়ন ॥ একদিন তুই গুরু—আমি চ্যালা।

জীবন ॥ আর একদিন আমি গুরু—তুই চ্যালা।

জুড়ন ॥ হ্যাঁ, সেই বেশ—অ্যাঁ! কি বললি?

জীবন ॥ যা বলেছি—বলেছি। তুই বলবি কালী—আর আমি বলবো থালি। অর্থাৎ থালি জপ ক'রে যাও। এটা ভালো বিজনেস। নইলে থিয়েটারে সারাজীবন ওই কাটা সৈনিক সাজবি আর রাত্তির বেলায় মুস্তফী সাহেব হুকুম দেবেন,—ওহে জীবন জুড়ন, কাল ভোরে তোমরা দু'জনে গিয়ে একবার গিরিশবাবুর খবরটা নিয়ে এসো তো! কেন? আমরা কি চাকর না অ্যাক্টর?

জুড়ন ॥ আমি ভাবছি কি জানিস?

জীবন ॥ কি?

জুড়ন ॥ ভাবছি গিরিশবাবুর মতো রেলাদার লোককে ওই পরমহংস পটালে কি ক'রে?

জীবন ॥ ওরে বাবা! এসব লোককে কি পটাতে হয়? এরা জন্ম থেকে পটেই থাকে। দেখছিস না বইগুলো কি লিখছে?

জুড়ন ॥ ঠিক তাই। তারপর যেই কোন সাধু-সন্ন্যাসী এসে গায়ে হাত বুলিয়ে দেয় অমনি একেবারে পটঃ পটৌ পটাঃ।

জীবন ॥ কিন্তু কথা হচ্ছে, গিরিশবাবু না থাকলে থিয়েটার তো উঠে যাবে ভাই।

জুড়ন ॥ আরে না না, বাবা, না। গিরিশ ঘোষ অত কাঁচা ছেলে নয়। সেও বাগবাজারের পোক্ত মাল। কোন হংসই তাকে চট্ ক'রে কমণ্ডলু ধরাতে পারবে না। মাস্টারমশাই বাইরে যত নরম ভেতরে ঠিক ততথানি শক্ত।

জীবন ॥ তবে শেষ কথা আমরাও ভেবে রেখেছি। যদি দেখি মাস্টারমশায় সন্ন্যাসী হবার চেষ্টা করছেন তাহ'লে আমরা থিয়েটারশুদ্ধ লোক

তাঁর সদর দরজার কাছে ব'সে হাংগার স্ট্রাইক শুরু করে দেবো। এবার চল্। আতা গিয়ে খবর দিয়েছে, বোধহয় উনি অপেক্ষা করছেন আমাদের জন্যে।

জুড়ন ॥ ভালো কথা—আমাদের গোবর্দ্ধনের বাড়িটা এখানেই না?

জীবন ॥ হ্যাঁ। ওই তো—সামনে।

জুড়ন ॥ কাল থিয়েটারে দেবকণ্ঠবাবু বলছিলেন তার নাকি খুব জ্বর হয়েছে।

জীবন ॥ তাই নাকি। তাহ'লে—ওই তো সামনে বাড়ি। চল্-না খোঁজট নিয়েই আসি।

জুড়ন ॥ সেই ভালো। চল্। [উভয়ের প্রস্থান

গিরিশচন্দ্র ও নিতাই দাসের প্রবেশ

নিতাই ॥ তাহ'লে যেমন যেমন বললেন—সেইভাবেই সিন্ আঁকবো?

গিরিশচন্দ্র ॥ হ্যাঁ, সেইভাবেই ক'রো। লক্ষ্য রেখো, সিন্গুলো যেন খ জাঁকজমকের না হয়—আর কটকটে চড়া রং দিও না। কে বলছি বলো তো নিতাই?

নিতাই ॥ আজ্ঞে ঠিক বুঝতে পারলাম না।

গিরিশচন্দ্র ॥ তাহ'লে শোন। বই হচ্ছে—চৈতন্যলীলা। ভক্তির প্লাবনে যখ স্টেজ ভেসে যাবে—তখন যেন পেছনের সিন দর্শকের চোখকে টে না ধরে—তাতে রসের ক্ষতি হবে।

নিতাই। বুঝেছি। আচ্ছা—তাহ'লে চলি। জয় গৌর!

গিরিশচন্দ্র ॥ ওহে, শোন—শোন নিতাই। তোমার ওই গৌরাঙ্গে মহিমার কথা কিছু বলো-না আমাকে।

নিতাই ॥ আপনি মহাজ্ঞানী। আপনি তাঁর জীবন নিয়ে চৈতন্যলী লিখেছেন। আহা! সুধা-ঢালা বই! আমি সামান্য চিত্রক আমি আপনাকে গৌরমহিমা কি বোঝাবো?

গিরিশচন্দ্র ॥ তবু—তবু কিছু বলো না ভাই, শুনি

নিতাই ॥ এই ধরুন সারাদিন খেটেখুটে বাড়িতে গিয়ে চানটান ক'রে নিজে রাঁধি। তারপর সেই খাবার—যেদিন যা পারি—গৌরসুন্দরের নামে নিবেদন ক'রে দিই। তারপর সেই প্রসাদ খেতে ব'সে দেখি,—(কেঁদে ফেললো) ভাত-রুটি-লুচি—যেদিন যা পারি—তাতে আমার গৌরের দাঁতের দাগ।

গিরিশচন্দ্র। দাঁতের দাগ।

নিতাই ॥ হ্যাঁ—আমার গৌরচাঁদের বিনোদমুখের দাঁতের দাগ। তাতেই বুঝতে পারি, গৌর আমার মতো অধমের ভোগও গ্রহণ করেছেন।

[কাঁদতে কাঁদতে প্রস্থান।

গিরিশচন্দ্র ॥ (চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে দেখলেন) নিতাই, তুমি ভাগ্যবান। তোমার ভক্তির টানে লোকান্তর থেকে এসে তোমার গুরু ভোগ গ্রহণ করেন। আর আমি মহাপাপী, আমার গুরু এখনো মিললো না। তাহ'লে কি ভগবান-টগবান সব বাজে কথা? সবই ইলিউশন? সব মায়া? সব ভ্রম?

জীবন ও জুড়নের পুনঃ প্রবেশ।

বন ॥ এই যে মাস্টারমশায়। আপনার ওখানেই যাচ্ছিলাম আমরা। পথে একবার গোবর্দ্ধনকে দেখে এলাম।

রিশচন্দ্র ॥ হ্যাঁ, তার জ্বর হয়েছিল শুনেছি। কেমন আছে সে?

ন ॥ ভালো আছে। জ্বরটা ছেড়েছে।

বন ॥ কাল রাতে মুস্তফী সাহেব বলেছিলেন, আপনার খোঁজ নিতে। আপনি তিন চারদিন রিহার্সালে যাননি।

রিশচন্দ্র ॥ হঠাৎ মনটা বড় অস্থির হয়েছে জীবন। একজন গাইডের অর্থাৎ গুরুর অভাব বড্ড ফীল্ করছি।

জীবন ॥ আপনিই তো স্যার আমাদের গাইড। তার ওপর যদি আপনি গাইড খোঁজেন…কিন্তু—আপনি তো স্যার ঈশ্বর মানেন না ব'লেই জানতাম।

গিরিশচন্দ্র ॥ এখনো যে মানি, এমন কথাই বা বলি কি ক'রে ?

জীবন ॥ তবে কথা হচ্ছে, ঈশ্বর আছেন স্যার। ঈশ্বর না থাকলে এই সংসার চলছে কেমন ক'রে ?

গিরিশচন্দ্র ॥ হ্যাঁ—বিপদে পড়লে মনে হয় বটে যে একজন ঈশ্বর থাকলে যেন ভালো হ'তো।

জুড়ন ॥ একথা কেন বলছেন মাষ্টারমশাই ?

গিরিশচন্দ্র ॥ কেন বলছি জানো ? একবার বন্ধুবান্ধব নিয়ে পাহাড়ে উঠে পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। সবাই ভগবানকে ড লাগলো। আমি চুপ ক'রে রইলাম। বন্ধুরা বললো,—চুপ ক'রে থাকলে চলবে না—তোমাকেও ডাকতে হবে।' বাধ্য হয়ে ডাকতে লাগলাম। আশ্চর্য ফল হ'লো। তক্ষুনি একজন একটা পথ দেখতে পেলো।

জীবন ॥ সেই থেকেই বুঝি নিয়মিত ডাকতে লাগলেন স্যার ?

গিরিশচন্দ্র ॥ না। সেই থেকে ডাকা একেবারে ছেড়ে দিলাম। ভাবলাম বিপদে পথ হারিয়ে ডাকলে যদি এই ফল হয়, সম্পদে পথ হারানে তো আরো মারাত্মক। সম্পদের মাঝখানে ব'সে যেদিন এম ব্যাকুল হ'য়ে ডাকতে পারবো সেদিন আবার ডাকবো। বিপদে তো সবাই ডাকে—সম্পদে ডাকে ক'জন ?

জুড়ন ॥ তাহ'লে স্যার—সেই নাস্তিকই তো রইলেন—মুস্তফী সাহে বলছিলেন,—হঠাৎ কি হ'লো ?

গিরিশচন্দ্র ॥ অর্ধেন্দুবাবুকে ব'লো,—কি হয়েছে তা বলতে পারবো না। কি হয়েছে। ফলে, একেবারে না-হওয়ার বালির চড়া থেকে হ হওয়ার মাঝগঙ্গায় পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি।

জুড়ন ॥ তাহ'লে থিয়েটারে গিয়ে মুস্তফী সাহেবকে কি বলবো স্যার ?

গিরিশচন্দ্র ॥ মুস্তফীকে ব'লো,—ভাবনার কোন কারণ নেই। থিয়েটার মানেই গিরিশ ঘোষ, আর গিরিশ ঘোষ মানেই থিয়েটার। নাটক আর অভিনয়—আমার অস্থি-মজ্জায় জড়িত—একমাত্র চিতার আগুনই পারবে গিরিশ ঘোষকে থিয়েটার থেকে বিচ্ছিন্ন করতে।

জুড়ন ॥ আমাদের সকলেরই খুব ভাবনা হয়েছিল স্যার। কাল দুপুরে আপনি আসছেন থিয়েটারে ?

[গিরিশচন্দ্র মাথা নাড়লেন,—হ্যাঁ।]	[জীবন ও জুড়নের প্রস্থান।

গিরিশচন্দ্র	প্রাণস্রোত কালস্রোত যমজ ভগিনী
হাতে হাত রেখে চলে মরণ-সাগরে।
দিন যায়, রাত যায়, হৃদয়ের বাঞ্ছা হায়
হ'ল না পূরণ। স্বপ্নসম মনে হয়
জগৎ সংসার, জায়াপুত্র পরিবার, ছায়া-
ছায়া ছবি। কোথায় আপনজন
হৃদয়ের ধন বলি বুকে লব যারে।
কই—কই সে—কোথায় ?
জীবন কাণ্ডারীরূপী গুরু ভবার্নবে ?

গীত।

নপথ্যে ভৈরব	যদি তোর আঁধার ঘরে নয়ন ঝরে
ডাক্ না মাকে—
ভোলা মন ডাক্ না মাকে।
খুলে ফ্যাল জীবন-ভরা বিফল-করা
ঢাকনাটাকে।
ওরে তুই ডাক্ না মাকে ॥

ভৈরবের প্রবেশ।

গিরিশচন্দ্র ॥ কি ক'রে খুলবো ? এ তো এক জন্মের নয়, জন্ম-জন্মান্তরের ঢাক্‌না। খোলার উপায়টা ব'লে দাও ভৈরব।

পূর্ব-গীতাংশ।

ভৈরব ॥ আমি তোর যাক্ না মরে
লাজ মান থাক্ না পড়ে
যারে তুই আপন ভেবে ধরিস চেপে
পাস্ না তাকে।
ভোলা মন ডাক্ না মাকে ॥

গিরিশচন্দ্র ॥ ঠিক—ঠিক বলেছ ভৈরব। "যারে তুই আপন ভেবে ধরিস চেপে পাস না তাকে।" তাহ'লে ? কাকে ধরবো আপন ভেবে ? কোথায় আমার সেই আপন ? কে সে ? কোথায় সে আপন ?

গীত।

ভৈরব ॥ মিছে তোর ভিক্ষে চাওয়া
পরের কাছে ;
ওরে তোর পরম পাওয়া
কাছেই আছে।
মা যে তোর দুখের রাতে
জেগে রয় আঁখির পাতে
সাড়া দেয় ঘুমের মাঝে দিনের কাজে
আকুল ডাকে।
ওরে তুই ডাক্ না মাকে ॥ [প্রস্থান

গিরিশচন্দ্র ॥ আমি মাকে ডাকবো আর ওদিকে থিয়েটার আমায় ডাকবে। সে ডাক তো আমি উপেক্ষা করতে পারবো না ভৈরব। ঈশ্বরের ওপরে আমার থিয়েটার।

তিরস্কার পুরস্কার　　করেছি কণ্ঠের হার
তথাপি এপথে পদ করেছি অর্পণ।
রঙ্গভূমি ভালবাসি　　হৃদে সাধ রাশি রাশি
আশার নেশায় করি জীবন যাপন।
আশার নেশায় করি জীবন যাপন ॥

[বলতে বলতে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

অভিনেত্রী বিনোদিনীর বাড়ি।

কথা বলতে বলতে বিনোদিনী ও ক্ষেত্রমণির প্রবেশ।

বিনোদিনী ॥ রিহার্সাল হবে?

ক্ষেত্রমণি ॥ হ্যাঁ।

বিনোদিনী ॥ চৈতন্যলীলা?

ক্ষেত্রমণি ॥ হ্যাঁ। মুস্তফী সাহেব থিয়েটারে এসে বললেন,—খেতু, বিনোদকে একটু খবর দাও। গিরিশবাবু রিহার্সালে আসবেন।

বিনোদিনী ॥ মাষ্টারমশায় আসবেন?

ক্ষেত্রমণি ॥ তাইতো বললেন মুস্তফী সাহেব।

বিনোদিনী ॥ আচ্ছা কি হয়েছে বলতো মাষ্টারমশায়ের? থিয়েটারে আসেননি কেন এ ক'দিন? কত লোকে কত কথা বলছে—

চুপ করে শুনে যাই। আগে রোজ একবার দয়া ক'রে সন্ধ্যের পর আমার এখানে আসতেন, এখন আর তাও আসেন না।

ক্ষেত্রমণি ॥ বিনু, আমি ঠিক জানি না। তবে মুস্তফী সাহেব, অমর্ত্য মিত্তির মশায়—এঁরা সব বলাবলি করছিলেন। শুনলাম, গিরিশবাবু হঠাৎ অস্থির হয়ে উঠেছেন গুরুলাভের জন্যে। ভালো ক'রে খাচ্ছেন না-দাচ্ছেন না, বাড়িতেও থাকেন না, দিনরাত নাকি পথে পথে ঘুরছেন।

বিনোদিনী ॥ গুরুলাভের জন্যে? সেকি! উনি তো ওসব বিশ্বাসই করেন না। বলেন,—মানুষ মানুষের গুরু হ'তে পারে না।

ক্ষেত্রমণি ॥ বিশ্বাস করতেন না, কিন্তু এখন নাকি করেন। অবিশ্যি সব কথা আমি জানিনে বিনু। তবে কালকে রাত্তিরে কর্তারা বলছিলেন তাই শুনলাম।

বিনোদিনী ॥ না না, ভাই। কোথায় যেন ভুল হচ্ছে সকলের। আমার চাইতে বেশী তো কেউ তাঁকে জানে না। তাঁকে জেনেছি, এমন অহংকারের কথা আমি বলতে পারবো না। তাঁকে জানা যায় না। তিনি গৃহীর বেশে সন্ন্যাসী। জামা-কাপড় পরেও নাগা সাধু। ভেতরটা সব গেরুয়া। তবে তাঁকে কিছুটা জানবার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। তাতেই বলতে পারি, গুরুকরণ তিনি বিশ্বাস করেন না। আজ যদি সত্যিই তিনি ক্ষেপে থাকেন তবে তার কারণ অন্য কিছু— গুরু নয়।

ক্ষেত্রমণি ॥ না রে। আমি শুনলাম— দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির মন্দিরে রামকৃষ্ণ পরমহংস ব'লে কে একজন আছেন, তিনিই নাকি মাষ্টারমশায়ের মনকে নাড়া দিয়েছেন।

বিনোদিনী ॥ কি জানি ভাই। অবাক লাগছে শুনে। তবে বলা যায় না। মানুষের মন তো! এই দিন—এই রাত্তির। এই রোদ—এই জল। যাই হোক, কাল দুপুরে আসছেন রিহার্সালে?

ক্ষেত্রমণি ॥ হ্যাঁ।

বিনোদিনী ॥ আচ্ছা। ওঁর অন্য বই-এর অভিনয় করেছি। কিন্তু এবার আমার বড্ড ভয় করছে খেতু। কেন জানি না, ওঁর মুখ থেকে যেদিন স্টেজে ব'সে আমরা সবাই নাটক শুনলাম সেদিন থেকেই বুকের মধ্যে গুর্ গুর্ করছে আমার। কেবলি মনে হচ্ছে, একটা কিছু ঘটবে।

[হঠাৎ দূরে শেয়ালের ডাক শোনা গেল।]

বিনোদিনী ॥ ওমা! রাত্তির ন'টা বেজে গেল বুঝি! আচ্ছা তুই যা খেতু। মুস্তফী সাহেবকে বলিস,—আমি ঠিক সময়ে হাজির হবো।

ক্ষেত্রমণি ॥ বলবো।

বিনোদিনী ॥ খেতু, সবাইকে খবর দেওয়া হয়েছে?

ক্ষেত্রমণি ॥ হ্যাঁ, সবাইকে খবর দেওয়া হয়েছে। যাই রে।

বিনোদিনী ॥ আয়।　　[ক্ষেত্রমণির প্রস্থান।

মোক্ষদার প্রবেশ।

মোক্ষদা ॥ মা, রান্না হয়ে গেছে। এই সময় গরম গরম ভেজে দিতাম, খেয়ে নিলে হ'তো।

বিনোদিনী ॥ আর একটু দেখি। যদি উনি আসেন—আর এসে শোনেন যে আমি খেয়ে নিয়েছি, তাহ'লে আর খাবেন না।

মোক্ষদা ॥ তা তো জানি মা। তাহ'লে কি আর একটু অপেক্ষা করবে?

বিনোদিনী ॥ হ্যাঁ।　　[মোক্ষদার প্রস্থান।

বিনোদিনী ॥ ঠাকুর! হে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু! হে নদীয়াবিনোদ! তুমি আমাকে রক্ষা করো! এতকাল গুরুর পায়ের কাছে ব'সে শিক্ষা ক'রে ভালো মন্দ যা হোক অভিনয় করেছি। কিন্তু এবারে আমি সংকটে পড়েছি প্রভু। এবার আমাকে উদ্ধার করো। আমার মতো

পাপিষ্ঠা তোমার বেশধারণ করবে—তোমার শ্রীমুখের কথা বলবে—হয়তো কতো ত্রুটি হবে—তুমি রুষ্ট হ'য়ো না দয়াল ! এবারের মতো আমাকে তরিয়ে দাও !

গীত।

নেপথ্যে মহামায়া ॥ আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধ'রে
যেখানে যাই সে যায় পাছে—
আমায় বলতে হয় না জোর ক'রে।

বিনোদিনী ॥ কে গাইছে আমার বাড়ির মধ্যে ! কে ? কে ?

মহামায়ার প্রবেশ।

পূর্ব-গীতাংশ।

মহামায়া ॥ মুখখানি সে যত্নে মুছায় আমার মুখের পানে চায়
আমি হাসলে হাসে কাঁদলে কাঁদে
কতই রাখে আদরে।

বিনোদিনী ॥ (একদৃষ্টে দেখে) কে গা তুমি ? তোমাকে তো এর আগে দেখেছি ব'লে মনে হচ্ছে না। কপালে সিঁদুর, বিয়ে হয়ে গেছে তোমার ?

মহামায়া ॥ হঁ্যা।

বিনোদিনী ॥ কোথায় থাকো তুমি ?

মহামায়া ॥ তোদের পাড়ায় ওই যে নেশাখোর ঠাকুরের মন্দির আছে—সেখানে থাকি।

বিনোদিনী ॥ এত রাত্রে আমার বাড়িতে এসেছো—কি চাও মা ? সাহায্য ?

মহামায়া ॥ দূর ! দূর ! সাহায্য চাইবো কেন রে ? বলে—আমিই কত লোককে সাহায্য করি—তার ঠিক নেই।

বিনোদিনী ॥ তুমি সাহায্য করো ?

মহামায়া ॥ করি বৈকি !

বিনোদিনী ॥ তাহ'লে কি চাও ?

মহামায়া ॥ বলছি, তুইও কি মুখে চুণকালি মেখে থিয়েটার করিস ?

বিনোদিনী ॥ হ্যাঁ।

মহামায়া ॥ তোদের তো চৈতন্যলীলা বই খুলছে—না ?

বিনোদিনী ॥ তুমি তাও জানো ?

মহামায়া ॥ জানি বৈকি ! পাঁচজনে পাঁচকথা বলে, শুনে শুনে জেনে নিই। তা আমায় একগাড়ি পাশ দিবি—প্রথম দিন ?

বিনোদিনী ॥ প্রথম দিনই পাশ চাই তোমার ? একগাড়ি পাশে কে যাবে ?

মহামায়া ॥ হুঁ ! আমার আবার যাবার লোকের অভাব নাকি ?

বিনোদিনী ॥ কিন্তু প্রথম দিনের পাশ দেওয়া তো—

মহামায়া ॥ তাহ'লে চাই না। গেলে প্রথম দিনই যাবো—নইলে নয়। প্রথম দিন কি যে মজা হবে—

বিনোদিনী ॥ মজা হবে ! কি মজা ?

মহামায়া ॥ বলবো কেন ? আগে প্রথম দিন আসুক—তখন দেখবি।

বিনোদিনী ॥ বেশ। ব'লে দাও কোথায় পাঠাবো তোমার পাশ ?

মহামায়া ॥ আ মর্ ! বললাম যে, নেশাখোর ঠাকুরের মন্দিরে ! যেখানে তুই মাসে দু'বার চতুর্দশীতে পূজো দিতে গিয়ে 'মহেশ' 'মহেশ' না বলে 'গিরিশ' 'গিরিশ' বলে কাঁদিস ? (প্রস্থানোদ্যত)

বিনোদিনী ॥ কি আশ্চর্য ! একথা তুমি কি ক'রে জানলে ?

মহামায়া ॥ শিবের পেছনে লুকিয়ে আমি সব শুনেছি। আর পারছি না বাপু তোর সঙ্গে বক্-বক্ করতে। আমি চললাম ! তুই পাশটা পাঠিয়ে দিস।

বিনোদিনী ॥ ও মেয়ে, শোন ! শোন—

মহামায়া ॥ আজ আর নয়। যা বলবার থিয়েটারের দিন বলিস। [প্রস্থান।

বিনোদিনী ॥ কি আশ্চর্য ! যে কান্না আমি মনে মনে কাঁদি—তার কথা এ মেয়ে জানলে কেমন ক'রে ? এসব কি হচ্ছে আমি তো বুঝতে পারছি না।

নেপথ্যে গিরিশচন্দ্র ॥ বিনোদ !

বিনোদিনী ॥ কে ?

নেপথ্যে গিরিশচন্দ্র ॥ আমি।

বিনোদিনী ॥ কোথায় আপনি ?

নেপথ্যে গিরিশচন্দ্র ॥ তোমার বুকের মধ্যে।

বিনোদিনী ॥ না—না। এ যে আমি স্পষ্ট আপনার গলা শুনতে পাচ্ছি। বুকের মধ্যে থেকে কি এত স্পষ্ট কথা কওয়া যায় ?

নেপথ্যে গিরিশচন্দ্র ॥ বুকের কথা তো মুখে বলা যায় না, বিনোদ। মন পেতে শুনতে হয়। শোন ! সামনের বুধবার আমরা চৈতন্যলীলা খুলবো। আগামীকাল থেকে তুমি রোজ গঙ্গাস্নান করবে, হবিষ্যান্ন গ্রহণ করবে, মাছ-মাংস খাবে না—আর আমার কথা না ভেবে চৈতন্য মহাপ্রভুর কথা ভাববে।

বিনোদিনী ॥ কার কথা ?

নেপথ্যে গিরিশচন্দ্র ॥ চৈতন্যের কথা।

বিনোদিনী ॥ না না—আমি পারবো না। শুনছো ? এমন আদেশ তুমি ক'রো না আমাকে। আমি পারবো না।

নেপথ্যে গিরিশচন্দ্র ॥ পারতেই হবে, বিনোদ। তোমার জন্য, আমার জন্য, আমাদের এ-জন্মের জন্য, পর-জন্মের জন্য, একাজ করতেই হবে।

বিনোদিনী ॥ ওগো, না না। আমি পারবো না। আমার কাছে কালী নেই, তারা নেই, শিব নেই, কৃষ্ণ নেই—আছো শুধু তুমি। আমার দেহ-মন-প্রাণ, আমার স্বর্গ-মর্ত্য, ইহকাল-পরকাল সব আমি তোমাকে দিয়েছি। দয়া ক'রে এ আদেশ ক'রো না তুমি আমায়। না না না— [দ্রুত প্রস্থান।

দ্বিতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য

দক্ষিণেশ্বর।

কথা বলতে বলতে অভেদানন্দ, বিবেকানন্দ ও রাম দত্তের প্রবেশ।

বিবেকানন্দ ॥ সেই চৈতন্যলীলা দেখবার পব আর জি.-সি.র সঙ্গে দেখা হয়নি, তাই না ?

অভেদানন্দ ॥ হ্যাঁ, সেই আগস্ট মাসে আমরা চৈতন্যলীলা দেখেছি।

রাম ॥ গিরিশ চুপ ক'রে থাকবার মানুষ নয় নরেন। নিশ্চয় সে নতুন কিছু ভাবছে। হয় কোন বই-টই, কিম্বা হয়তো আমাদের ঠাকুরের কথাই ভাবছে দিনরাত।

বিবেকানন্দ ॥ ঠাকুরের কথা তার ভাববার সময় কোথায় রামবাবু ? থিয়েটার, মদ, আর মেয়ে মানুষ তাকে একেবারে ঘিরে আছে।

অভেদানন্দ ॥ কাগজে দেখছিলাম—গিরিশবাবু এর মধ্যে আরো দু'তিনখানা নাটক লিখেছেন। প্রহ্লাদ চরিত্র, নিমাই সন্ন্যাস—এ দুটো প্লেও হয়েছে। সেদিন থিয়েটারের একজন লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। শুনলাম—প্রভাস যজ্ঞ আর বুদ্ধদেব চরিত নামে আরও দুটো নাটকে হাত দিয়েছেন।

বিবেকানন্দ ॥ নাঃ! জি.-সি. যে জিনিয়াস—এ বিষয়ে কোন তর্ক নেই। জিনিয়াস—তবে মিস্-গাইডেড্। ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে হয়তো ফুল ফুটতো। কিন্তু প্রাক্তন। ওর ভাগ্যই ওকে যোগাযোগ রাখতে দেবে না।

রাম ॥ নরেন-ভাই, আমার কিন্তু একেবারে উল্টো কথা মনে হয়। গিরিশের ওপর ঠাকুরের আকর্ষণ বেড়েছে।

বিবেকানন্দ ॥ কিসে বুঝলে ?

রাম ॥ কাল দুপুরে একবার, সন্ধ্যের পর আর-একবার—দু'বার গিরিশের নাম করতে শুনলাম।

অভেদানন্দ ॥ কি বললেন ঠাকুর ?

রাম ॥ দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ঘুমুতে যাওয়ার আগে আমাকে ডেকে বললেন,—রাম, তুই একবার খবর নিস্ তো—গিরিশটা এতো জ্বালাচ্ছে কেন আমাকে ? আমি বললাম,—সে তো আসেই না, আপনাকে জ্বালাচ্ছে কেমন ক'রে ? এই কথা শুনে ঠাকুর খুব হাসলেন এক-চোট, কিন্তু কিছু বললেন না।

বিবেকানন্দ ॥ (হেসে) আশ্চর্য ! রাত্রে কি বললেন ?

রাম ॥ রাত্রে বললেন,—থ্যাটার যাত্রা খুব ভালো জিনিস রে, খুব ভালো জিনিস। এও এক ধরনের জনসেবা। ওতে লোকশিক্ষে হয়। এও মায়ের কাজ। মা সন্তুষ্ট হন এতে। হয়েছে কি জানিস—মানুষ উন্মার্গগামী হয়েছে। ধম্মের কথা বললে—শোনে না। ওইভাবে নেচে-কুঁদে বললে—চুপ ক'রে শোনে। তারপর বাড়িতে গিয়ে ভাবে।

বিবেকানন্দ ॥ সেকথা ঠিক। দেখেছো কালী,—গুরু আমাদের কি রকম অন্তর্যামী ! ইস্কুলের লেখাপড়া শেখেননি, অথচ কি ভাবে থিয়েটার যাত্রার ভেতরকার কথাটা ধ'রে ফেলেছেন। সাধু-সন্ন্যাসীর এত মডার্ণ মন দেখা যায় না।

নেপথ্যে রামকৃষ্ণ ॥ জয় মা ! জয় মা !

ধ্যানের আমেজ নিয়ে রামকৃষ্ণের প্রবেশ।

রামকৃষ্ণ ॥ নরেন !

বিবেকানন্দ ॥ বলুন—

রামকৃষ্ণ ॥ পেয়েছি রে, পেয়েছি।

রাম ॥ কি পেয়েছেন ?

রামকৃষ্ণ ॥ হাল হদিশ। কেবলই মনে হচ্ছিল—সুতোর আগাটা খুঁজে পাচ্ছিনি কেন ? পেয়েছি আজ দুপুরে। (সবাই চুপ ক'রে শুনছে) দুপুরে মায়ের ভোগ নিবেদন করছি। হঠাৎ দেখি একটা ছেলে, ছোট ছেলে, একেবারে ল্যাংটো—নাচতে নাচতে মায়ের ঘরের মধ্যে ঢুকলো। তারপর আমার সামনে থেই-থেই ক'রে নাচতে লাগলো। ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া একমাথা চুল ঝুঁটি করে বাঁধা, কোমরে রুপোর পেটি,—চোখদুটো লাল টকটকে। বাঁ-হাতে একটা মদের বোতল আর ডানহাতে সুধার পাত্র।

বিবেকানন্দ ॥ তারপর ?

রামকৃষ্ণ ॥ বললাম, কে রে তুই ? বললো,—চিনতে পারছো না—আমি ভৈরব গো, ভৈরব। তোমার সঙ্গে কতবার দেখা হ'লো আর মনে করতে পারছো না ? বললাম,—হ্যাঁ রে, কোথায় দেখা হ'লো তোর সঙ্গে ? বললো,—কেন, বাগবাজারের বসুপাড়ায়। এই ব'লে আবার নাচতে নাচতে মায়ের কাছে গিয়ে সট্ ক'রে মিশে গেল। জয় মা ! জয় মা !

সকলে ॥ (সমস্বরে) গিরিশবাবু !

রামকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁ। তখন মনে পড়লো—ওর সঙ্গে পেরথম যেদিন দেখা হয় সেদিন কেন আমি ওকে আগে নমস্কার করেছিলাম। মা যেন আমায় দিয়ে ঘাড়ে ধ'রে করিয়ে নিলে। মনের মধ্যে মা আমায় দেখিয়ে দিলে। (একটু চুপ ক'রে থেকে) নরেন !

বিবেকানন্দ ॥ আজ্ঞে !

রামকৃষ্ণ ॥ কি যেন সেই গানটা রে ?

বিবেকানন্দ ॥ কোন্ গানটা ?

রামকৃষ্ণ ॥ ওরে সেইটে রে ! সেই যে—কপালে যা আছে কালী !

বিবেকানন্দ ॥ গাইব ?

রাম ॥ হ্যাঁ, গাও ভাই। আহা ! নরচন্দ্র রায়ের গানটি ছোট, কিন্তু বড়
ভালো।

(গান গাইবার জন্য বিবেকানন্দ প্রস্তুত হচ্ছেন।)

গীতকণ্ঠে ভৈরবের প্রবেশ।

গীত।

ভৈরব ॥ কপালে যা আছে কালী তাই যদি হবে।
শ্রীদুর্গা জয় দুর্গা ব'লে কেন ডাকা তবে ॥
ললাটে লিখেছেন বিধি, তাই বলবান যদি।
শিব তবে সত্যবাদী কেমনে সম্ভবে ॥

রামকৃষ্ণ ॥ জয় মা ! জয় মা ! হ্যাঁগো, তোমাকে সেদিন থ্যাটারে দেখলাম না

ভৈরব ॥ হ্যাঁ, বাবা।

বিবেকানন্দ ॥ বড় ভালো গান গাও তুমি। থাকো কোনদিকে ?

ভৈরব ॥ থাকি বাবা সব জায়গায়।

রাম ॥ তুমি দক্ষিণেশ্বরেও আসো ?

ভৈরব ॥ হ্যাঁ। দক্ষিণের ঈশ্বর যে আমার ঈশ্বর গো।

অভেদানন্দ ॥ তোমার ঈশ্বর ? সে আবার কে ?

ভৈরব ॥ ওই যে সামনে দাঁড়িয়ে। আমার জন্ম-জন্মান্তরের ঈশ্বর। আমাকে উদ্ধার করবেন ব'লে যাঁর এবার ভবে আসা। কখনো পুবে, কখনো পশ্চিমে. কখনো উত্তরে, কখনো দক্ষিণে থেকে আমাকে উদ্ধার করেন। এবার আমার গুরু দক্ষিণেশ্বর। (বিবেকানন্দকে) কিছু বুঝলে ?

বিবেকানন্দ ॥ বুঝলাম—তুমি পাগল নও।

ভৈরব॥ এই মরেছে! পাগল কেন হ'তে যাবো? আমি ভৈরব। হ্যাঁ গো গুরু, পাগল আর ভৈরব কি এক?

রামকৃষ্ণ॥ না না না। কখনোই নয়। তবে কি জানিস্, ভৈরব আর পাগল হ'লো এক মা'র পেটের দুই ভাই। কিন্তু যমজ ভাই। পাগল না হ'লে ভৈরব হওয়া যাবে না, আবার ভৈরব না হ'লে পাগল হওয়া তো খুবই কঠিন।

ভৈরব॥ (বার-বার নমস্কার ক'রে) জয় ঠাকুর! জয় ঠাকুর! প্রভু মুখই খুললে যখন, কৃপা ক'রে এবার আমাকে বুঝিয়ে দাও—কেমন ক'রে যোগ করলে দুই আর দুই-এ চার হয়। প্রত্যেকবার আসছি, প্রত্যেকবার যোগ করছি—দুই আর দুই-এ হয় তিন হচ্ছে, নয় পাঁচ হচ্ছে। হয় কম, নয় বেশী। গুরু, আর ঘুরিয়ো না। এবার আমাকে যোগের মন্তরটা ব'লে দিও।

রামকৃষ্ণ॥ দেবো রে, দেবো। আর ঘোরাঘুরি করতে হবে না। এবার তোকে ঠিক যোগের মন্তর শিখিয়ে দেবো। তুই আসিস মাঝে মাঝে এখানে, বুঝলি? কোথায় থাকিস যেন বললি?

ভৈরব॥ ওই যে বললাম—বাগবাজারের বসুপাড়ায়।

গীত।

ভৈরব॥ শুকনো তরু মঞ্জুরে না

ভয় লাগে মা ভাঙ্গে পাছে

তরু পবন বলে সদাই দোলে

প্রাণ কাঁপে মা থাকতে গাছে॥

[গীতকণ্ঠে প্রস্থান।

[ভৈরব চলে যেতে ঠাকুর হঠাৎ হো-হো ক'রে হাসতে সুরু করলেন।

সে হাসি থামার নাম নেই। এরই মধ্যে উপরোক্ত গানটি দূর থেকে মেয়েলি গলায় শোনা গেল।]

শুকনো তরু মঞ্জুরে না
ভয় লাগে মা ভাঙ্গে পাছে।
তরু পবন বলে সদাই দোলে
প্রাণ কাঁপে মা থাকতে গাছে॥

রামকৃষ্ণ॥ (সঙ্গীত শুনে অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। হঠাৎ যেন সম্বিত ফি পেয়ে) ওরে নরেন—

বিবেকানন্দ॥ আজ্ঞে?

রামকৃষ্ণ॥ কালকে আমরা থ্যাটার দেখতে যাবো।

অভেদানন্দ॥ আবার?

রামকৃষ্ণ॥ হ্যাঁ, আবার। রাম, কি বলিস?

রাম॥ আমি বলি,—আপনার ইচ্ছে হয়েছে যখন—তখন যাওয়াই যাক না

রামকৃষ্ণ॥ এ্যাই! এইটে হ'লো লাখ কথার এক কথা। ইচ্ছে হয়ে যখন—তখন যাওয়াই যাক্-না। কি বলিস, তাহ'লে কাল কখ যাওয়া যায় বলতো রাম?

রাম॥ কাল তো শুনেছি—গিরিশবাবুর নতুন বই খুলবে। বিকেল চার নাগাদ আমরা বেরিয়ে পড়লেই হবে।

রামকৃষ্ণ॥ হ্যাঁ, সেই ভালো। সেই ভালো। (যেতে যেতে) ওরে, তোর এমন মুখভার ক'রে থাকিসনে। চব্বিশ ঘণ্টা জপ-তপ কর কি ভালো? জপ-তপও করতে হবে আবার থ্যাটারও দেখ হবে। জপ-তপ না করলে থ্যাটারও হয় না, বুঝলি? একই মানু আজ রাম সাজছে, কাল রাবণ সাজছে—এ কি তপস্যা না থাক হয়? জয় মা! জয় মা! দেখে কত জ্ঞানলাভ করা যায়

কালকেও হয়তো দেখবি—কত জ্ঞানলাভ করলি। একটা লোক মদ খায় বলেই তাকে তোরা দেখতে পারবিনে—কি থাকের সাধু রে তোরা ? তামাক খেলে যখন ঘেন্না করিস না, তখন মদ খেলেই বা করবি কেনে ?　　[সকলের প্রস্থান।

[গান তথনো শোনা যাচ্ছে।]

শুকনো তরু মঞ্জুরে না

ভয় লাগে মা ভাঙ্গে পাছে ·

দ্বিতীয় দৃশ্য

মহামায়ার সঙ্গে বিনোদিনীর প্রবেশ।

গীত।

হামায়া॥　বড় আশা ছিল মনে

ফল পাব মা এই তরুতে—

তরু মঞ্জুরে না, শুকায় শাখা

ছটা আগুন বিগুন আছে।

কমলাকান্তের কাছে

ইহার একটি উপায় আছে।

জনম্ জরা মৃত্যু হরা—

তারা নামে ছেঁচলে বাঁচে।

শুকনো তরু মঞ্জুরে না···

(বিনোদিনী চেয়ে রইলো মহামায়ার দিকে।)

হামায়া॥ তোমার কি হয়েছে গো ? তোমার মা বললো,—তুমি ভালো

ক'রে খাচ্ছো না-দাচ্ছো না। সব সময় অন্যমনস্ক, সব সময় নাবি কাঁদছো। কেন?

বিনোদিনী ॥ আমার যে কি হয়েছে—তা আমি নিজেই জানি না মহামায়া মনের মধ্যে খালি হু-হু করছে। আমার খেতে ভালো লাগছে ন' কথা বলতেও ভালো লাগছে না।

মহামায়া ॥ ভালো লাগছে শুধু কাঁদতে?

বিনোদিনী ॥ হ্যাঁ। মনে হচ্ছে, কোন নির্জন জায়গায় গিয়ে ব'সে ব'সে খালি কাঁদি আর ঠাকুরের কথা ভাবি।

মহামায়া ॥ খেয়েছে! তোকেও ঠাকুরে ধরেছে?

বিনোদিনী ॥ হ্যাঁ মা। কী যে হ'ল সেদিন। পার্ট শেষ ক'রে সবে সাজঘরে ঢুকেছি, এমন সময় কে একজন এসে বললো,—ঠাকুর তোমাকে ডাকছেন। গেলাম। সেই শ্রীচৈতন্যের পোশাকেই গেলাম। তিনি কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আমার মাথায় হাত রেখে বললেন,—চৈতন্য ক'রে ভারী আনন্দ দিয়েছিস্! মা, তোমার চৈতন্য হোক! (ক্রন্দন সে যে কী আনন্দ মহামায়া, আমি বুঝিয়ে বলতে পারবো না (একটু থেমে) কী দেখলাম—সেই শ্রীমুখের দিকে চেয়ে। কী ছিল তাঁর সেই স্পর্শের যাদুতে—আজ আর আমার কিছুই মনে নেই কিন্তু সেইদিন থেকে আমার দেহ থেকে-থেকে শিউরে উঠছে মা। মনে হচ্ছে—আমায় দিয়ে সংসারের আর কোন কাজ হবে না।

মহামায়া ॥ ও ব্যাটার ওই রকমই ভড়কি। এমন কায়দা ক'রে ছুঁয়ে দে' যে, একেবারে ইহকাল পরকাল ঝরঝরে ক'রে দেয়। দেখছিস্ না— নরেন-ছোঁড়ার কী দশা করলে! বাপ-মা কোথায় হা-পিত্যেশ ক'রে ব'সে আছে, ছেলে পাশ করেছে, রোজগার করবে, সংসারে দুঃখু মিটবে। ওমা! তাকে পড়্ পড়্ ক'রে টেনে নিয়ে গিয়ে—

গেরুয়া পরিয়ে কানে মন্তর দিয়ে একেবারে সাত ভিখিরির এক ভিখিরি ক'রে ছেড়ে দিলে গা ! ও ব্যাটার কাণ্ডই ওই রকম।

বিনোদিনী ॥ তুমি ঠাকুরকে দেখেছ মহামায়া ?

মহামায়া ॥ দেখিনি আবার—খুব দেখেছি।

বিনোদিনী ॥ উনি দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণির কালী-মন্দিরের পুরোহিত—না ?

মহামায়া ॥ পুরুত না ছাই ! ওরে, ও মন্তর-টন্তর একদম কিছু জানে না। খালি ভোগ সামনে নিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে কাঁদে আর বলে,—মা খাও, মা পরো। আর মাও এমন আহ্লাদী যে তাতেই খায়, তাতেই পরে।

বিনোদিনী ॥ এক এক সময় তুমি এমনভাবে কথা বলো, মনে হয়—কত কথাই না জানো তুমি। মা খান কি না-খান, তুমি কি ক'রে জানলে মহামায়া ?

মহামায়া ॥ আমার কিছু জানতে বাকী নেই গো, কিছু বাকী নেই। আমি সব জানি। বলি—আমিও তো ওই বামুনদের মন্দিরেই থাকি। সব দেখি ব'সে ব'সে। (হেসে উঠে) ভাগ্যিস্ মা-কালী কথা কয় না, তাই। নইলে একেই তো ন্যাংটো মেয়ে—কথা বলতে পারলে একদম পাগল হয়ে যেতো। রাত হয়ে গেল মা, আমি এবার যাই।

বিনোদিনী ॥ এসো। তুমি মাঝে মাঝে এসো। কেমন ? তুমি যখন আসো, তোমার সঙ্গে যেন শান্তি আসে, স্বস্তি আসে। আর আসে আনন্দ। তুমি আবার এসো।

মহামায়া ॥ আসবো—আসবো। তুই কাঁদিস্‌নে। আমি আবার আসবো।

বিনোদিনী ॥ এই নিয়ে দিন-তিনেক তুমি এলে, কিন্তু তোমার কোন পরিচয়ই জানা হয়নি। কোথায় থাক তুমি, স্বামী কি করেন—বল-না, মা !

মহামায়া ॥ তোর দেখছি কিছুই মনে থাকে না। বলেছি না, আমি বামুনদের বাড়ি—ওই যে বাড়িতে মন্দির আছে—ওরই পুরুতের বাড়িতে থাকি।

বিনোদিনী ॥ বড় রাস্তার ধারে? যে বাড়িতে শিব আর কালীর মন্দির আছে?

মহামায়া ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ—সেই বাড়ি।

বিনোদিনী ॥ আমি কখনো যাইনি। শুনেছি—ওই মন্দিরের মা খুব জাগ্রতা। যে যা মানত করে, তাই নাকি ফলে।

মহামায়া ॥ (হেসে) তুই মানত ক'রে দেখেছিস কখনো?

বিনোদিনী ॥ না।

মহামায়া ॥ বেশ তো, করেই দেখ-না একবার। (হেসে) তুই আর কীই-বা মানত করবি? সেই তো—'আজ যেন গিরিশবাবু আসেন।'—এই তো?

বিনোদিনী ॥ (চমকে) কি আশ্চর্য! আমি এক্ষুনি এই কথাটাই ভাবছিলাম। তুমি কি ক'রে জানলে?

মহামায়া ॥ দূর বেটি! এই সামান্য কথাটা জানবার জন্যে কি হাত গণনা শিখতে হয়? তোকে দেখেই তো বোঝা যায়,—লোকটা কত দিন আসেনি, ছট্‌ফট্ করছে মনটা।

মনের কথা ও সব জানে। নিজে এসে ধরে, কিন্তু ধরা দেয় না। কে এই রহস্যময়ী ?

নেপথ্যে গিরিশচন্দ্র ॥ বিনোদ !

বিনোদিনী ॥ আসুন।

গিরিশচন্দ্রের প্রবেশ।

বিনোদিনী ॥ আমি জানি, আপনি আজ আসবেন।

গিরিশচন্দ্র ॥ কি ক'রে জানলে ?

বিনোদিনী ॥ একটু আগে আমাকে মহামায়া ব'লে গেছে, আজ আপনি আসবেন।

গিরিশচন্দ্র ॥ আবার মহামায়া! এই মেয়েটি কে বিনোদ ? তোমাকে আর আমাকে একসঙ্গে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে। খোঁজ নিয়ে দেখেছো—কোথায় থাকে ?

বিনোদিনী ॥ বললে,—মোড়ের মাথায় ওই যে ঠাকুরবাড়ি যেখানে শিব আর কালীর মন্দির আছে সেই মন্দিরের পূজারীর বাড়িতে থাকে।

গিরিশচন্দ্র ॥ খোঁজ নিয়েছো—সত্যি সে ওখানে থাকে কি না ?

বিনোদিনী ॥ না।

গিরিশচন্দ্র ॥ দাঁড়াও, তাহ'লে এখুনি চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন ক'রে নেওয়া যাক্। শম্ভু ! শম্ভু !

গিরিশচন্দ্র ॥ যাবি আর আসবি।

শম্ভু ॥ আচ্ছা। [প্রস্থান।

বিনোদিনী ॥ কেন এটা করলেন ?

গিরিশচন্দ্র ॥ কেন, কি দোষ হ'ল ?

বিনোদিনী ॥ মহামায়া ব'লে কেউ যদি থাকে—তবে তো খুবই ভালো। কিন্তু যদি শুনি যে, ওখানে কেউ ও নামে থাকে না, তাহলে কি হবে ?

গিরিশচন্দ্র ॥ তাহ'লে মহামায়াকে বোঝা যাবে, সত্যি তিনি মহা, না সবটাই তাঁর মায়া—এটা তো বোঝা দরকার বিনোদ।

বিনোদিনী ॥ আপনি কি বলতে চান যে—

গিরিশচন্দ্র ॥ আমি কিছুই বলতে চাই না, বিনোদ। আমি শুধু বুঝতে চাই। যদি নিজে জানতে পারি তখন সবাইকে জানাব—তার আগে নয়।

বিনোদিনী ॥ দীক্ষা নেওয়া হয়েছে ?

গিরিশচন্দ্র ॥ না। তবে এবার হবে। গুরু ব্রহ্মা, গুরুর্বিষ্ণু ব'লে যাঁর পায়ে মাথা ঠেকাবো, তাঁকে এতদিন খুঁজে-খুঁজে হয়রাণই হয়েছি শুধু। পাইনি। এবার ঠাকুর কৃপা ক'রে নিজে থেকে ধরা দিয়েছেন। এবার দীক্ষা নেবো। (একটু থেমে) কিন্তু তাই ব'লে এটা যেন ভেবো না, আমার পরীক্ষার শেষ হলো। যতদিন রামকৃষ্ণ আছেন আর গিরিশ ঘোষ আছে, ততদিন আমি তাঁকে পরীক্ষা ক'রে যাবো।

দীনু ভট্টাচার্যের প্রবেশ।

দীনু ॥ গিরিশবাবু!

গিরিশচন্দ্র ॥ আসুন—আসুন ভট্চাজ মশায় !

দীনু ॥ আমাকে ডেকেছেন শুনলাম—

গিরিশচন্দ্র ॥ আপনি মায়ের সেবক। আপনাকে ডাকার স্পর্ধা যেন আমার

কোনদিন না হয়। এই পাঁচ টাকা রাখুন, মায়ের আর ভোলানাথের পুজো দেবেন।

দীনু ॥ আপনার নামেই দেবো তো?

গিরিশচন্দ্র ॥ হ্যাঁ। বরং আমার আর বিনোদের নামে দেবেন।

দীনু ॥ আচ্ছা। আমি তাহ'লে এখন আসি?

গিরিশচন্দ্র ॥ একটু দাঁড়ান। আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস্ করবো। আচ্ছা, আপনার বাড়িতে মহামায়া ব'লে কোন মেয়ে আছে কি?

দীনু ॥ আমার বাড়িতে? মহামায়া? না তো! আমরা শুধু কর্তা গিন্নী থাকি একটা ঘরে।

বিনোদিনী ॥ ঠাকুরমশায়! মন্দিরের মালিকরাও তো ওই একই বাড়িতে থাকেন?

দীনু ॥ হ্যাঁ, মা।

বিনোদিনী ॥ তাঁদের বাড়িতে মহামায়া নামে একটি মেয়ে থাকে কি?

দীনু ॥ না, মা। কর্তার দুটি ছেলে—মেয়ে নেই। বড়ছেলের বিয়ে দিয়েছেন। তারও একটি ছেলে—মেয়ে নেই।

(বিনোদিনী স্তম্ভিতের মত চেয়ে রইলো)

গিরিশচন্দ্র ॥ (মুচকে হাসছিলেন, এবার হাত তুলে নমস্কার করলেন) আচ্ছা, আপনি আসুন।

[দীনু ভট্টাচার্যের প্রস্থান।

গিরিশচন্দ্র ॥ এবার বুঝলে বিনোদিনী,—মহামায়া ব'লে কেউ কোথাও নেই।

বিনোদিনী ॥ কিন্তু—

গিরিশচন্দ্র ॥ ওই 'কিন্তু'-টুকুতেই তিনি আছেন, বিনোদ। নেই—কিন্তু আছেন। মূর্তি নেই—কিন্তু মূর্তি ধ'রে তিনি দেখা দিয়েছেন তোমার কাছে—আমার কাছে। দেবতাদের কাছে তিনি মহাদেবী, কিন্তু আমাদের কাছে তিনি মহামায়া। হয়তো-বা সত্যিই

তিনি—দৈবীমায়া। কিন্তু কেন? কেন আমাদের ওপর এই অযাচিত অনুগ্রহ তাঁর? পুণ্যের কোঠায় তোমার আমার সঞ্চয় তো কিছুই নেই, বিনোদিনী। (বিনোদিনীর ক্রন্দন) তুমি কাঁদছো? তোমার তবু কাঁদবার শক্তি আছে, তুমি কাঁদতে পারো। কিন্তু আমার তো সে শক্তি নেই। ছিল হাসবার শক্তি। হাসতে পারতাম। শত্রু-মিত্র, ঠাকুর-দেবতা—সকলের মুখের ওপর হেসে উঠতে পারতাম আমি। কিন্তু আজ দেখছি, সেই হাসবার শক্তিও আমার নেই। আমাকে এমন নখ-দন্তহীন ক'রে কোথায় নিয়ে চলেছে—তাও তো বুঝতে পারছিনে। যাক্‌গে, শোন! খবর পেয়েছি, ঠাকুর আসবেন কালকে থিয়েটার দেখতে। তোমার চৈতন্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন, তাই তোমার নিমাই দেখতে আসছেন। সাবধানে অভিনয় ক'রো। এসো—আমার খাওয়ার কিছু রেখেছো কি?

বিনোদিনী ॥ হ্যাঁ।

গিরিশচন্দ্র ॥ তাহ'লে চলো। ক্ষিদে পেয়েছে। [উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

থিয়েটারের সম্মুখ।

কথা বলতে বলতে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ,
অভেদানন্দ ও রাখালের প্রবেশ।

রামকৃষ্ণ ॥ জয় মা! জয় মা! এই নিমাই অমিয় সাগরে স্নান ক'রে প্রাণ ভরে গেল, মন ভরে গেল। রাখাল, কি রকম লাগলো বল্? তুই তো খালি থ্যাটার দেখবো না দেখবো না বলতিস? দেখলি তো? আর বলবি কখনো?

রাখাল ॥ না। আমার খুবই ভালো লেগেছে।

রামকৃষ্ণ ॥ রামটা নিজের খেয়ালে থাকে, আজ এলে খুব আনন্দ পেতো।

বিবেকানন্দ ॥ আমি কিন্তু খুব আনন্দ পেয়েছি খেয়ে। নিমাই সন্ন্যাসের চাইতে লুচি আলুর দম আর মিষ্টিটা আমার অনেক বেশী ভালো লাগলো।

রামকৃষ্ণ ॥ কোথাকার পেটুক রে এটা! দিনরাত কেবল খাই-খাই! আর সারাক্ষণ গিরিশ যে পেছনে দাঁড়িয়ে সবাইকে হাওয়া করলো —সেটা বলছিসনে কেন?

বিবেকানন্দ ॥ ও আর বলবো কি? আপনি এসেছেন, জি. সি. তো বাতাস করবেই।

রামকৃষ্ণ ॥ বাতাস করবেই! জয় মা! জয় মা! এটা কি থাকের সন্নিসী তেরী হচ্ছে, আমি তো বুঝতে পারছিনে। হ্যাঁ রে, তুই লোকজনের মুখের ওপর পট্-পট্ ক'রে যা তা বলিস—তুই কেমন সন্নিসী? অ্যাঁ?

বিবেকানন্দ ॥ তা এখন কি করা যাবে? আমি মনে বিরক্তি নিয়ে মুখে মিষ্টি কথা বলতে পারি না।

রামকৃষ্ণ ॥ শুনলি? শুনলি রাখাল? কালী, শুনলি? মনে বিরক্তি নিয়ে— আর তুই ব্যাটা সাধু মানুষ,—মনে বিরক্তি আসবে কেন তোর?

মদমত্ত গিরিশচন্দ্রের প্রবেশ।

রামকৃষ্ণ ॥ আয় গিরিশ। আজ ভারী আনন্দ নিয়ে ফিরে যাচ্ছি রে। যেমন সুন্দর থ্যাটার হয়েছে, তেমনি সুন্দর খাওয়া। তোর জয়-জয়কার হোক! খুব সেবা করেছিস আজ।

গিরিশচন্দ্র ॥ তোমাকে সেবা ক'রে তো আশ মেটে না ঠাকুর। মনে হয়—সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে দিনরাত খালি তোমার সেবা করি। একটা কথা বলবো?

রামকৃষ্ণ ॥ বল্! বল্!

গিরিশচন্দ্র ॥ তুমি আমার ছেলে হয়ে এসো-না ঠাকুর,—তাহ'লে প্রাণভরে তোমার সেবা করি।

রামকৃষ্ণ ॥ দূর শালা! আমি বামুন, তুই কায়েত—আমি তোর ছেলে হ'তে যাবো কেন?

গিরিশচন্দ্র ॥ না, তা বললে আমি শুনবো না। তোমাকে আমার ছেলে হতেই হবে।

রামকৃষ্ণ ॥ না না, বামুনের ঘরে জন্মে শেষকালে আমি কায়স্থের ছেলে হ'তে পারবো না। দূর! দূর!

বিবেকানন্দ ॥ তুমি অযথা ঠাকুরকে প্রেসার দিচ্ছো জি. সি.?

গিরিশচন্দ্র ॥ কিসের প্রেসার? কাকে বলে প্রেসার? কে কাকে প্রেসার দিচ্ছে? ভক্তের মনোবাঞ্ছাই যদি পূর্ণ করতে না পারো তাহ'লে কোন কলার সাধু তুমি?

রামকৃষ্ণ ॥ আরে, তুই আমার কথাটা বুঝবি তো!

গিরিশচন্দ্র ॥ কেন বুঝবো তোমার কথা? কিসেব গরজ আমার তোমার কথা বোঝার? এদিকে পরমহংস নাম নিয়েছো। দক্ষিণেশ্বরে ভড়ং ক'রে বসেছো। ভড়ং ক'রে 'জয় মা' 'জয় মা' ব'লে ঘুরে বেড়াও। আর এদিকে কাজের বেলায় ঢুঁ ঢুঁ?

বিবেকানন্দ ॥ এটা কি হচ্ছে গিরিশবাবু?

গিরিশচন্দ্র ॥ আমার যা মনে হচ্ছে—তাই হচ্ছে। আমি যা ইচ্ছে করছি—তাই হচ্ছে। আবার কি হবে? হুঁ! সাধু! সন্ন্যিসী! মায়ের সেবক! ভক্তের ইচ্ছে পূর্ণ করার এক কড়ার মুরোদ নেই—খালি ভাব-সমাধির ভড়ং! ওসব ভড়ং আমরা থিয়েটারে নিত্যি তিরিশদিন করছি, বুঝেছো? ওসব কায়দা আমাদের দেখিয়ো না।

রামকৃষ্ণ ॥ ওরে, এযে গালাগাল দিচ্ছে? এটা কি থাকের ভক্ত রে?

গিরিশচন্দ্র ॥ না। আমি আর তোমার ভক্ত নই। যত রাজ্যের ভালো ভালো ছেলেগুলোকে টেনে নিয়ে এসে মাথা মুড়িয়ে, গেরুয়া পরিয়ে, সর্বনাশ করছো,—আবার আমাকে তোমার ভক্ত বানাতে চাও? জেনে রাখো, গিরিশ ঘোষ সে মাল নয়।

অভেদানন্দ ॥ ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ! তখনই আপনাকে বারণ করা হয়েছিলো এখানে আসতে।

বিবেকানন্দ ॥ শুধু আসতে নয়, এইভাবে বার-বার আসতে। এরা সব পঞ্চমকারের সাধক।

গিরিশচন্দ্র ॥ (টলছেন) পঞ্চমকারের সাধকের কাছে থিয়েটারের পাশ চাইতে লজ্জা করে না—না? তখন মায়ের নাম ক'রে বেশ চাওয়া যায়! হুঁ! আমারই ভুল হয়েছিলো। পৃথিবীতে অনেকেই মহাপুরুষ ব'লে চলে যায়। কিন্তু আওয়াজ দিলেই বোঝা যায়—ফাঁকা মাল।

বিবেকানন্দ ॥ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এগুলো শুনতে কি ভালো লাগছে আপনার? একটা লোক মাতাল হয়ে ডাউন-রাইট অপমান করছে আপনাকে, আর আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছেন?

রামকৃষ্ণ ॥ না না, তা নয়, তা নয়। আমি ভাবছি, এটা কি থাকের ভক্ত। সাধুকে গালাগাল দিয়ে পিতৃমাতৃ উচ্ছন্নে দিচ্ছে!

গিরিশচন্দ্র ॥ কে সাধু? তুমি যদি সাধু হও, তবে আমি মহাত্মা। মহাত্মা গিরিশ ঘোষ।

দ্রুত বিনোদিনীর প্রবেশ।

বিনোদিনী ॥ একি সর্বনাশ করছেন আপনি? মহাপুরুষকে কি এইভাবে কেউ অপমান করে?

রামকৃষ্ণ ॥ বল্ তো মা, বল্ তো মা। আমাকে বললে,—তুমি আমার ছেলে হও। আমি বললাম,—তুই কায়েত, আমি বামুন। আমি

তার ছেলে হবো কি ক'রে? এই একেবারে ক্ষেপে গিয়ে যা-তা গালাগাল দিতে শুরু করলে।

বিনোদিনী ॥ গুরু হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি আপনার কাছে। আপনি রাগ করবেন না ঠাকুর।

রামকৃষ্ণ ॥ না না, আমি রাগ করিনি, রাগ করিনি মা।

বিনোদিনী ॥ আপনি রাগ করলে সব জ্বলে যাবে বাবা।

গিরিশচন্দ্র ॥ হুঁ! জ্বলে যাবে! সাধু যদি জেনুইন হয় তবে জ্বলে যেতেও পারে। এ তো ভণ্ড সাধু। খালি ভড়ং আর ভড়কি। (হেসে) আমায় চেনোনি বাবা। আমার নাম গিরিশ ঘোষ—বাগবাজারের ছেলে। আমার ছেলে হয়ে জন্মালে তুমি বর্তে যেতে। বুঝলে ঠাকুর, বর্তে যেতে।

বিনোদিনী ॥ চুপ করুন আপনি। আজ কোন জ্ঞান পর্যন্ত নেই আপনার। কাকে কি বলছেন আপনি? আসুন!

গিরিশচন্দ্র ॥ কোথায় যাবো?

বিনোদিনী ॥ ভেতরে চলুন। অনেক হয়েছে—আর নয়।

বিবেকানন্দ ॥ (ঠাকুরকে) এবার চলুন। আরও কি শুনতে চান? ওই দেখুন—রাখাল কাঁদছে।

রামকৃষ্ণ ॥ রাখালে, কাঁদছিস কেন? ওরে, কাঁদিসনে। খবরদার, যেন তোদের চোখের জল এখানে না পড়ে। তা'হলে সর্বনাশ হবে গেরস্থের।

গিরিশচন্দ্র ॥ ঘোড়ার ডিম হবে!

রামকৃষ্ণ ॥ সব সময় মনে রাখবি যে, তোরা সন্ন্যাসী। গেরস্থের নানান জ্বালা। কখন কি মেজাজ থাকে বলা যায় কি? তাই শুনে বিচলিত হ'লে চলে? চল—ফিরে যাই আমরা।

অভেদানন্দ ॥ এত কটু কথা গিরিশবাবুর মুখ দিয়ে বেরোতে পারে—এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

রামকৃষ্ণ ॥ ভাববি কি ক'রে? কথাগুলো ও তো বলেনি। ওর মুখ দিয়ে—

বিবেকানন্দ ॥ মা আপনাকে কথাগুলো শুনিয়ে দিলেন। ভালো। এতে যদি আপনি সান্ত্বনা পান—পাবেন। কিন্তু আমরা এতে সান্ত্বনা পাবো না। আপনি সর্বত্যাগী মহাপুরুষ। এ অপমান হয়তো আপনার গায়ে লাগে না, কিন্তু আমাদের লেগেছে। আমরা আজকের কথা এতো তাড়াতাড়ি ভুলবো না। [প্রস্থান।

অভেদানন্দ ॥ চলুন—আমরাও যাই।

গিরিশচন্দ্র ॥ যাও। কিন্তু একটা কথা শুনে যাও আমার কাছ থেকে। ওঁকে তোমরা গুরু ব'লো না। গুরু হবার যোগ্যতা ওঁর নেই। তোমাদের গেরুয়া পরিয়েছেন, উনি নিজে গেরুয়া পরেন না কেন? সন্ন্যাসী! সন্ন্যাসীর কোন লক্ষণ ওঁর মধ্যে নেই। ওসব খেলা অনেক দেখেছি। বুঝেছ মাণিক? ও খেলা দিয়ে গিরিশ ঘোষকে কাবু করা যাবে না। আমি কায়েত, তুমি বামুন। এখনো বামুন শুদ্দুরের ভেদজ্ঞান যায়নি তোমার মন থেকে—পরমহংস হয়েছো? যাও। আর কোনদিন আমার সামনে এসো না!

বিনোদিনী ॥ (কাঁদতে কাঁদতে গিরিশকে টেনে নিয়ে চললো) আপনি আর একটা কথা বললে আজ রাত্রেই আমি আত্মহত্যা করবো।

গিরিশচন্দ্র ॥ (বিনোদিনীর কথায় সম্বিত ফিরে আসতেই তার দিকে তাকিয়ে) চলো— [বিনোদিনীসহ প্রস্থান।

রামকৃষ্ণ ॥ চল্। আমি শুধু ভাবছি, গিরিশ কী থাকের ভক্ত? দু'খানা লুচি খাইয়ে একেবারে আমার পিতৃমাতৃকুল উচ্ছন্নে দিলে গা! তবে ব্যাপার কি জানিস? ভক্ত-ভৈরব তো! ওর প্রেমও যেমন ভয়ংকর, ওর ক্রোধও তেমনি ভয়ংকর। হতেই হবে, হতেই হবে। [অভেদানন্দকে ধরে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

গীতকণ্ঠে ভৈরবের ও তৎপশ্চাতে মহেন্দ্রবাবুর প্রবেশ।

গীত।

ভৈরব ॥ মা বলে ডাকিস না রে মন
মাকে কোথায় পাবি ভাই।
থাকলে আসি দিত দেখা
সর্বনাশী বেঁচে নাই।
শ্মশানে মশানে কত, পীঠস্থান ছিল যত,
খুঁজে হলাম ওষ্ঠাগত, কেন আর যন্ত্রণা পাই।
গিয়ে বিমাতার তীরে কুশ-পুত্তল দাহ করে
অশৌচান্তে পিণ্ড দিয়ে কালাশৌচে কাশী যাই।
দ্বিজ নরচন্দ্র ভনে
মন, মায়ের জন্যে ভাব ক্যানে
মা গেছে, নাম ব্রহ্মা আছে
তরিবার ভাবনা নাই ॥

মহেন্দ্র ॥ তোমায় নতুন দেখছি। এই প্রথম এলে বুঝি দক্ষিণেশ্বরে?

ভৈরব ॥ না বাবা, প্রথম কেন আসবো। তবে রোজ তো আসতে পারি ন ঘুরে ঘুরে আসি। চলি বাবা। প্রণাম হই। [প্রস্থান

বিবেকানন্দ ও রাম দত্তের প্রবেশ।

মহেন্দ্র ॥ কথাটা বলতে বলতে চলে গেলে। তারপর কি হলো?

বিবেকানন্দ ॥ তারপর গিরিশবাবুর কাণ্ড দেখে রাখাল তো কেঁদেই খু কি করবো, কি বলবো বুঝতেই পারছি না। একে লোকটা ভে

ড্রাঙ্ক, তার ওপর লেগেছে সেন্টিমেণ্টে চোট—মুখ দিয়ে অনর্গল গালাগাল বেরোচ্ছে।

মহেন্দ্র ॥ এ তো ভারী আশ্চর্য ঘটনা। গিরিশবাবুর মত নাট্যকার, জ্ঞানী মানুষ, কেন এরকম একটা কাণ্ড করলেন—এটাও তো ভাববার কথা।

বিবেকানন্দ ॥ ভাববার কিছুই নেই। যাত্রা থিয়েটারের লোক এই রকমই হয়। মদ আর মেয়েছেলে যাদের ক্যাপিটাল তাদের কাছে এর চেয়ে বেশী আশা করাই ভুল।

মহেন্দ্র ॥ না না। তাহলেও—ঠাকুর বলেন—যাত্রা-থিয়েটারে লোকশিক্ষা হয়। সেকি তিনি এমনি বলেন ভাই ?

রাম ॥ আপনারা কথা বলুন, আমি এখুনি আসছি একবার পঞ্চবটি থেকে ঘুরে। [প্রস্থান।

বিবেকানন্দ ॥ আমার কথাটা আমি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি মহেন্দ্রবাবু। দেখুন, তাবৎ দুনিয়ার ব্যবসাপত্তর চলে দিনে। রাতে বন্ধ করে। আর এঁদের ব্যবসা খোলে রাত্রে—দিনমান বন্ধ। গোটা পৃথিবীর মানুষ—মানুষের সঙ্গে এমনি কথা বলে সাদা মুখে—কিন্তু এঁরা মুখে চুণকালি না মেখে অর্থাৎ হেভি মেক্ আপ্ না করে লোকের সামনে বেরোতেই পারেন না। আপনি আমি কথা বললে তার মধ্যে থাকে আন্তরিকতা, কিন্তু এঁদের কথার মধ্যে আছে নাটক। কাল যে গিরিশবাবু অতগুলো কথা বললেন—আমার তো মনে হল একজন এফিসিয়েন্ট অ্যাক্টর একটা মাতালের পার্ট বেশ ভালভাবেই করে গেল।

মহেন্দ্র ॥ ঠাকুর কিছুই বললেন না ?

বিবেকানন্দ ॥ একেবারে কিছুই বললেন না বললে মিথ্যে বলা হবে, ঠাকুর বারে-বারেই বলতে লাগলেন—এটা কী থাকের ভক্ত রে ? কিন্ত

আমার তখন এত রাগ হয়েছিল আমি সহ্য করতে না পেরে চলে এসেছিলাম। কালির কাছে শুনলাম—ঠাকুর নাকি আসার সময় বলেছেন—ও তো ভৈরব, ওর প্রেম যেমন ভয়ংকর, ক্রোধও তেমনি ভয়ংকর।

মহেন্দ্র॥ সেকথা ঠিক। অন্তর্যামী ভগবান ঠিকই বুঝেছেন সে মাইনাস-মদ গিরিশবাবু কি বস্তু।

বিবেকানন্দ॥ তাহলে এটাও তাঁর বোঝা উচিত ছিল যে প্লাস-মদ গিরিশবাবু শুধু ভৈরব নয়—কাল-ভৈরব।

মহেন্দ্র॥ আমি কি বলবো ভাই? ঠাকুর মঙ্গলময়, নিশ্চয়ই তাঁর কোন মঙ্গল ইচ্ছা নিহিত আছে এর মধ্যে।

বিবেকানন্দ॥ থাকতে পারে। তবে মহেন্দ্রবাবু, আমরা সাধারণ মানুষ—তত্ত্ব-টত্ত্ব কিছু কম বুঝি। গালাগালিটাকে আমরা কদর্য গালাগালি বলেই বুঝি—তার মধ্যে ভবিষ্যতের কোন মঙ্গল-ইচ্ছা দেখতে পাইনে। কালকে গিরিশবাবুর ব্যবহার আমার খুব খারাপ লেগেছিল। কয়েকবার মনে হয়েছিল—লোকটাকে ঘা কতক দিয়ে ওর নেশাটা ছুটিয়ে দিই।

'জয় মা' 'জয় মা' বলতে বলতে রামকৃষ্ণের প্রবেশ।

রামকৃষ্ণ॥ না না না। নেশা ছুটিয়ে দিলে চলবেনি। নেশা রাখতে হবে—নেশা রাখতে হবে। এই যে মহেন্দর, কখন এলি?

মহেন্দ্র॥ আজ্ঞে এই কিছুক্ষণ আগে।

রামকৃষ্ণ॥ কাল থ্যাটারে কী হয়েছে শুনেছিস? গিরিশ চারখানা লুচি, আলুর দম আর দুটো মিষ্টি খাইয়ে আমার পিতৃমাতৃ উচ্ছন্নে দিয়েছে।

মহেন্দ্র॥ আজ্ঞে হ্যাঁ! নরেনের কাছে শুনছিলাম।

রামকৃষ্ণ॥ একটু নেশা করেছিল। বুঝলি? আমাকে বললে—তোমার সেবা করবো প্রাণভরে—তুমি আমার ছেলে হও।

মহেন্দ্র। তাই বললে ?

রামকৃষ্ণ॥ হ্যাঁ রে। তবে আর বলছি কি! আমি বললাম—দূর শালা, আমি বামুন, তুই কায়েত। আমি তোর ছেলে হব কী করে? ওরে বাপ রে—তারপরই যা গালাগাল দিতে শুরু করলো সে আর থামতে চায় না। ভাগ্যিস সেই সময় চৈতন্যময়ী এসে পড়েছিল তাই রক্ষে—নইলে আরো কি যে বলতো—

বিবেকানন্দ॥ আর কি বলবে? বলতে কিছুই বাকী রাখেনি।

রামকৃষ্ণ॥ নরেন খুব রেগে গিয়েছে। ও তো রাগ করে আমাকে ফেলেই চলে এল। রাখালেটা কাঁদতে আরম্ভ করলে। ও আমার গোপাল তো কড়া কথা সহ্য করতে পারে না। কেঁদে ফ্যালে। নরেন, কালি, ওরা তবু কিছুটা শক্ত আছে।

বিবেকানন্দ॥ শক্ত নরমের কথা নয়। আমার মনে হয়, জীবনে আর আপনার গিরিশবাবুর মুখদর্শন করা উচিত নয়।

রামকৃষ্ণ॥ বটেই তো। কালকে বাপু বড্ড গালাগাল দিয়েছে আমাকে। মহেন্দর, তুই কি বলিস?

মহেন্দ্র॥ এই অবস্থায় আমিও নরেনের কথাই বলি। কিছুদিন গিরিশবাবুকে দর্শন না দিলে যদি ওঁর মনে অনুতাপ আসে তাহ'লে সেটা ভালই বলতে হবে।

রাম দত্তের পুনঃ প্রবেশ।

রামকৃষ্ণ॥ হ্যাঁ, তা ভালোই বলতে হবে। এই যে রাম, কাল থ্যাটারে কী কাণ্ড হয়েছে শুনেছিস? কালকে গিরিশ চারখানা লুচি, আলুর দম আর মিষ্টি খাইয়ে আমার পিতৃমাতৃ উচ্ছন্নে দিয়েছে।

রাম॥ ভালই তো করেছে।

বিবেকানন্দ॥ ভালই তো করেছে মানে?

রাম ॥ হ্যাঁ, ভালই করেছে।

রামকৃষ্ণ ॥ ভালই করেছে কি রে? আমরা তার অতিথি, থ্যাটার দেখতে গেছি। দুখানা লুচি খাইয়ে সে আমার তিনকুল উচ্ছন্নে দিলে, আর তুই বলছিস কিনা ভালই তো করেছে!

রাম ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। একদিন বাসুকী এলেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে। প্রণাম করবার সময় বাসুকীর মুখ থেকে খানিকটা বিষ বাসুদেবের পায়ের ওপর পড়লো। শ্রীকৃষ্ণ বিরক্ত হয়ে বললেন—হ্যাঁ রে, এত বিষ কেন তোর মুখে? বাসুকী হাতজোড় করে বললেন—প্রভু, আমাকে যা দিয়েছেন তাই দিয়েই তো প্রণাম করবো। সুধা তো দেননি আমাকে যে সুধা দিয়ে চরণ বন্দনা করবো। কাজেই গিরিশকে আপনি যা দিয়েছেন তাই সে আপনাকে দিয়েছে।

রামকৃষ্ণ ॥ জয় মা! জয় মা! তাহলে নরেন, মহেন্দর, এরা বলছে—জীবনে আর গিরিশের মুখদর্শন করা আর আমার উচিত নয়।

রাম ॥ বেশ তো।

রামকৃষ্ণ ॥ বেশ তো নয়, বেশ তো নয়। তুই কি বলিস—জীবনে আর গিরিশের মুখদর্শন করা উচিত নয়?

রাম ॥ আমার তো মনে হয় এখুনি সেখানে যাওয়া উচিত।

রামকৃষ্ণ ॥ জয় মা! জয় মা!

বিবেকানন্দ ॥ আপনি বলছেন কি রাম-দাদা? এত অপমানের পরেও—

রাম ॥ হ্যাঁ ভাই নরেন, তাই বলছি। গুরুর অপমানে আমাদের অন্তর যে-রকম জ্বলছে, নেশা ছুটে যাবার পর তার অবস্থাটা কী হয়েছে —সেটাও তো আমাদের একবার ভাবা উচিত।

রামকৃষ্ণ ॥ জয় মা! জয় মা!

বিবেকানন্দ ॥ কিসের গরজ আমাদের সেকথা ভাবার বলুন? একটা মাতালের মদ খাওয়া আর মদ না-খাওয়ার মাঝখানের সময়টুকুতে

তার আচ্ছন্নতাই কাটে না। হোয়াট ডু উই কেয়ার ফর্ দ্যাট? যদি যান গিয়ে দেখবেন সে হয়তো আরও মদ খেয়ে আরও মাতাল হয়ে তাণ্ডব-নৃত্য করছে। এখন তার ওখানে যাওয়া আর আগুনে ঘৃতাহুতি দেওয়া এক কথা। কাল রাত্রে বিনোদিনী ধরে ফেলেছিল তাই হাত তোলেনি। এখন তার বাড়ীতে গেলে সে হাত তুলবে।

রামকৃষ্ণ॥ সত্যিই তো রাম। গিরিশ ব্যাটা যদি আরো মাতাল হয়ে আমাকে আরো অপমান করে?

রাম॥ অপমানিত হবেন।

রামকৃষ্ণ॥ ওমা! অপমানিত হবো কী রে? শেষকালে ক্ষেপে গিয়ে যদি আমাকে মারে?

রাম॥ মার খাবেন। যাকে অনুগ্রহ করেছেন তার নিগ্রহও সইতে হবে বৈকি!

রামকৃষ্ণ॥ জয় মা! জয় মা! ঠিক বলেছিস রাম। রামের আমার বুদ্ধিটা বড় পরিষ্কার। তাহ'লে নরেন, একখানা ঘোড়ার গাড়ী ডাক দিকিনি বাবা। একেবারে যাওয়া আসা ঠিক করে নিবি। বুঝলি?

বিবেকানন্দ॥ আমাকেও যেতে হবে?

রামকৃষ্ণ॥ ও রাম, এ ব্যাটা বলে কি! শুধু তুই কেন? তোরা সবাই যাবি। ওরে কাল রাত্রে কাল-ভৈরবের কালের দিকটা আর কালোর দিকটা দেখেছিস্, আজ তার ভৈরবের দিকটা দেখবি চল।

[বিবেকানন্দের প্রস্থান।

[গিরিশচন্দ্রের কণ্ঠস্বর : গুরু, রক্ষা করো! গুরু, রক্ষা করো!]

রামকৃষ্ণ॥ রাম, হঠাৎ আমার মনটা বড় অস্থির হয়ে উঠলো। নিশ্চয়ই তার কোন বিপদ ঘটেছে। চল্ চল্—তাড়াতাড়ি চল্।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য

গঙ্গাতীর।

কথা বলতে বলতে গিরিশচন্দ্র ও অতুলের প্রবেশ।

অতুল ॥ দাদা, আমার কথা শুনুন। আপনি মহাজ্ঞানী, আপনাকে আমি কী বোঝাব? সে সাধ্যই বা কই আমার? কাল রাত্রে আপনি গুরুকে অপমান করেছেন। সে তো আপনি এমনি করেননি নেশার ঘোরে—

গিরিশচন্দ্র ॥ না অতুল, এমনিই করি আর নেশার ঘোরেই করি, গুরুকে অপমান করেছি বলে আমার মোটেই দুঃখ হচ্ছে না। আমার কষ্ট হচ্ছে—আমি শিষ্যদের মনে আঘাত করেছি বলে। নরেন ছিল রাখাল ছিল, কালি ছিল, খুব দুঃখ পেয়েছে ওরা। ঠাকুরকে গালাগাল দিয়েছি, বেশ করেছি। মানুষের গালাগাল ভগবানের গায়ে লাগে না, কিন্তু ছেলেদের আমি মর্মান্তিক কষ্ট দিয়েছি. আজ তার প্রায়শ্চিত্ত করবো।

অতুল ॥ কিন্তু দাদা আমাকে লুকোবেন না। আপনি গঙ্গাতীরে এসেছেন আত্মহত্যা করতে, বলুন ঠিক কি না? শোনা-এস্তোক বৌঠান হাউ হাউ করে কাঁদছেন।

গিরিশচন্দ্র ॥ অতুল, জগতে গিরিশ ঘোষের স্ত্রী কাঁদবে না তো কে কাঁদবে ভাই? মোদো মাতাল নোটো গিরিশ ঘোষের স্ত্রী—কান্না ছাড়া তার সম্বল কোথায়? তুমি তো রইলে ভাই, তুমি ওকে দেখো।

অতুল ॥ ওকথা বলবেন না দাদা, গিরিশ ঘোষের তুলনা গিরিশ ঘোষ। এত নাম-যশ-সুনাম, এত নাটক যার স্বামীর—

গিরিশচন্দ্র ॥ কিচ্ছু থাকবে না অতুল, কিচ্ছু থাকবে না। এই নাম-যশ-সুনাম, চারিদিকের এই ধন্য ধন্য রব—কিচ্ছু থাকবে না। কাল মুছে দেবে। এমন কি, এই যে বাড়ী-ঘর-দোর দেখছো যার মধ্যে কত পূজো, কত উৎসব, কত আনন্দ-বেদনার সঞ্চয়—প্রতিটি ইট কাঠ গাঁথা রইল—আমার মন বলে, এও হয়তো একদিন থাকবে না, পরিবর্তে দেখবে—একফালি পাথরের ওপর লেখা আছে: হিয়ার লিভ্ড্ গিরিশচন্দ্র ঘোষ—দি ড্রামাটিস্ট। হয়তো বেঁচে থাকবে দু' একটি নাটক—তাও যদি গুরু কৃপা করে রাখেন, নইলে আর কিছু থাকবে না, কেউ থাকবে না।

অতুল ॥ আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন না দাদা,—বাড়ী চলুন।

গিরিশচন্দ্র ॥ তুমি যাও ভাই। এ জীবনের আর কোন মূল্য নেই আমার কাছে। মদের নেশায় উন্মত্ত হয়ে যে গুরুরূপী সাক্ষাৎ ভগবানকে অপমান করে—সে কি মানুষ? তার কি আর মানুষ বলে পরিচয় দেওয়া উচিত? নাঃ, কাল রাত্রে আমি সোনার চাঁদ ছেলেদের মনে কষ্ট দিয়েছি—এ প্রাণ আমি রাখবো না।

অতুল ॥ দাদা!

গিরিশচন্দ্র ॥ বাড়ী যাও অতুল, বাড়ী যাও। কিচ্ছু বলা যায় না—আমি যে রকম কাউয়ার্ড, হয়তো দেখবে—আমিও তোমার পেছনে পেছনেই বাড়ীতে পৌঁছে গেছি। তুমি আর দেরী ক'রো না ভাই। তোমাকে না দেখলে তোমার বৌঠান আরো উতলা হয়ে পড়বেন। যাও।

অতুল ॥ (ক্রন্দন) ঠিক আছে, আপনার আদেশেই আমি বাড়ী যাচ্ছি। কিন্তু যাবার আগে আপনাকে আমি ভগবান রামকৃষ্ণের চরণেই সমর্পণ করে গেলাম। রাখলে তিনিই রাখবেন, মারলে তিনিই মারবেন। [কাঁদতে কাঁদতে প্রস্থান।

গিরিশচন্দ্র ॥ (অতুলের দিকে চেয়ে) নাট্যকার গিরিশ ঘোষ, চলো—এবার গুরুকে অপমান করবার প্রায়শ্চিত্ত করবে চলো। পতিতোদ্ধারিনী গঙ্গে! গিরিশ ঘোষের পাপস্পর্শে তুমি যেন শুকিয়ে যেও না মা! এই মোদো মাতাল নোটো গিরিশের জ্বালা তুমি জুড়িয়ে দাও মা! (উত্তরদিকে মুখ করে) অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকায়, চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

[নারীকণ্ঠের খিল্ খিল্ হাসির শব্দ ভেসে এলো]

মাথায় ঘোমটা কলসী-কাঁখে মহামায়ার বকতে বকতে প্রবেশ।

মহামায়া ॥ মিনষের ঢং দেখে আর বাঁচিনে। পাড়া গাবিয়ে, লোকজনকে জানিয়ে, নহবৎ বসিয়ে, রসুনচৌকি বাজিয়ে তবে মরতে চললো।

গিরিশচন্দ্র ॥ কে মরতে চললো? তুমি কার কথা বলছো মা?

মহামায়া ॥ কার কথা আর বলবো? আমার কপালের কথাই বলছি। মরতে যাচ্ছে আমার বাড়ীর লোক আবার কে? রাত্তির বেলায় আমাকেই গালমন্দ করলো—সকাল বেলায় তার ধম্মোজ্ঞান উথ্‌লে উঠলো। বললো—তোমাকে অপমান করেছি—এ প্রাণ আমি আর রাখবো না।

গিরিশচন্দ্র ॥ কী আশ্চর্য! মনে হচ্ছে, মেয়েটি যেন আমার কথাই বলছে! তুমি কে মা?

মহামায়া ॥ পরিচয়ে আর দরকার কি বাছা? মা বলে ডেকেছো, ধরে নাও—আমি তোমার মা। মুখপোড়াকে ভোরবেলাতেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে ভাবলাম, কলসীটা নিয়ে যাই—জলও ভরে আনবো আর দেখে আসবো, জলে ডুবে মরবে বলে গঙ্গার ঘাটে গেছে কি না!

গিরিশচন্দ্র ॥ দেখতে পেয়েছো?

মহামায়া ॥ না। ডুবে মরবার মতো লোক তো ঘাটের ধারে কাউকে দেখছিনে। তবু বলা যায় না, নেশাখোরকে বাবা বিশ্বেস নেই। থেকে থেকে সব বেমক্কা কাজ করে ফেলে। (একটু থেমে) কী ভাবছো বাবা?

গিরিশচন্দ্র ॥ ভাবছি মা, পৃথিবীতে কত রকমের কত ঘটনাই না ঘটে। তুমি এসেছ—তোমার নেশাখোর স্বামী যাতে ডুবে না মরে—তাকে বাঁচাতে। আর আমি মোদো মাতাল নোটো গিরিশ ঘোষ, আজ এখানে এসে দাঁড়িয়েছি আত্মহত্যা করবো বলে। তোমার সঙ্গে কথা বলে অনেকখানি সময় নষ্ট হয়ে গেল।

মহামায়া ॥ ওমা, সে তো ভালই হল গো, ইচ্ছেটা গেছে তো মন থেকে? যদি গিয়ে থাকে তবে এবার বাড়ী যাও।

গিরিশচন্দ্র ॥ সে ইচ্ছে যাবার নয় মা! নেশার ঘোরে গুরুকে অপমান করেছি, গুরুভাইদের অপমান করেছি, এ প্রাণ আমি আর রাখবো না।

মহামায়া ॥ (হেসে উঠে) কিছু মনে ক'রো না বাবা—কিন্তু কথাটা তুমি এমনভাবে বললে যে মনে হলো—প্রাণ তোমার ঘরের বউ, তাকে যা হুকুম করবে—তাই সে করবে। তাই কি কখনো হয় বাবা? মায়ের পেট থেকে প্রাণ যখন বেরিয়ে এসেছিল তখনও যেমন তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে আসেনি—আজও যখন তুমি ভাবছো প্রাণ আর রাখবে না—ঠিক দেখে নিও, তার যদি যাবার ইচ্ছে না থাকে তোমার সাধ্য কি তাকে নষ্ট করার? তার চাইতে আমি বলি—ঘরে ফিরে যাও। থিয়েটার-টিয়েটার যা করছিলে তাই করোগে। (একটু দূরে গিয়ে) আর স্থবিধেমতো একদিন একগাড়ী পাস পাঠিয়ে দিয়ো। [প্রস্থান।

গিরিশচন্দ্র ॥ (চমকে উঠলেন, হঠাৎ মনে পড়ে গেল মহামায়ার কথা। চিৎকার করে উঠলেন) মা! সন্তানকে দেখা দিয়ে এভাবে চলে

যেয়ো না মা। মা! বুঝেছি—এইভাবে কালহরণ করে আমার মন থেকে আত্মহত্যার ইচ্ছেটাকে মুছে ফেলতে এসেছিলে। কিন্তু পারবে না মা, পারবে না। কারণ আমি তো গঙ্গায় ডুবতে আসিনি, এ যে আমার শ্বখাত সলিল। কারো দোষ নয় মা, দোষ আমার নিজের—কারো দোষ নয়। জয় গুরু! জয় গুরু! জয় গুরু!

নেপথ্যে বিনোদিনী ॥ আপনি চলে গেলে আমার কী উপায় হবে বলে দিন। আমি যে আপনারই নাম জপ করতে করতে রামকৃষ্ণ নাম পেয়েছি।

নেপথ্যে অতুল ॥ একাজ করবেন না দাদা। আপনি জ্ঞানী, গুনী—আপনি প্রাজ্ঞ। আত্মহত্যা মহাপাপ!

নেপথ্যে মহামায়া ॥ বলি—প্রাণ কি তোমার ঘরের বউ যে তাকে যে হুকুম করবে, তাই সে করবে? তার যদি যাবার ইচ্ছে না থাকে তোমার সাধ্য কি তাকে নষ্ট করার?

নেপথ্যে কহুকণ্ঠে ॥ গিরিশবাবু···গিরিশ, ফিরে এসো···গিরিশবাবু, চলে আসুন···থিয়েটারে যেতে হবে।···রিহারসালে যেতে হবে।··· নতুন নাটক লিখতে হবে।···

নেপথ্যে বিনোদিনী ॥ আমার কী উপায় হবে বলে দিন।

নেপথ্যে অতুল ॥ দাদা, আত্মহত্যা মহাপাপ!

নেপথ্যে মহামায়া ॥ প্রাণ কি তোমার ঘরের বউ যে তাকে যে হুকুম করবে তাই সে করবে?

গিরিশচন্দ্র ॥ (উন্মাদের মতো চীৎকার ক'রে উঠলেন) না না না। আমি কোন কথা শুনবো না, এখান থেকে ফিরে গিয়ে কোনদিন আর ওই করুণাময় মহাপুরুষের মুখের দিকে চাইতে পারবো না। মা গঙ্গা, অধম সন্তানকে কোল দাও মা! জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ! (প্রস্থানোদ্যত)

নেপথ্যে রামকৃষ্ণ ॥ গিরিশ! গিরিশ রে!

গিরিশ ॥ (থমকে দাঁড়িয়ে) কে ? কে ?

নেপথ্যে রামকৃষ্ণ ॥ গিরিশ ! গিরিশ রে !

রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, মহেন্দ্র ও রাম দত্তের প্রবেশ।

রামকৃষ্ণ ॥ (গিরিশের সামনে দাঁড়িয়ে হেসে) ঈশ্বর ইচ্ছায় এলুম। (গিরিশ চেয়ে আছেন গুরুর মুখের দিকে) কি রে, কথা বলছিস না কেন ? বাড়ী চল্।

গিরিশ ॥ হ্যাঁ, যাব। তোমার আদেশ, নিশ্চয় বাড়ী যাব। কিন্তু তুমি এলে কেমন করে ? ওই অপমানের পরেও তুমি কী করে আবার আমার সামনে এসে দাঁড়ালে প্রভু ? তোমার কি একটু ভয়ও করলো না ?

রামকৃষ্ণ ॥ এই ছ্যাখ ! ভয় কেন করবে রে পাগলা ? মদ খেয়ে তুই গাল দিয়েছিস বলে আমি তোকে ছেড়ে চলে যাব ? ওরে, আমি তোর তেমন গুরু নই রে গিরিশ। আর সবাই আমার কাছে এক একজন ষোল আনা। কিন্তু তুই ষোল আনার ওপরে আরও পাঁচ আনা। তুই যে আমার একটাকা পাঁচ আনার ভক্ত।

[মহেন্দ্র একপাশে দাঁড়িয়ে নোটবুকে একমনে পেন্সিল দিয়ে কী লিখে যেতে লাগলেন।]

গিরিশচন্দ্র ॥ বুঝেছি গুরু, বুঝেছি। তাই বুঝি আগের মতো মন্দিরের মধ্যে রত্ন-সিংহাসনে বসে মানুষের পুজো নেওয়ার ওপর ঘেন্না ধরে গেছে ? তাই বুঝি শ্রীরামকে অযোধ্যায় আর শ্রীকৃষ্ণকে দ্বারকায় সমুদ্রতীরে রেখে এবার রামকৃষ্ণ হয়ে নেমে এসেছ শ্যামল মাটির বাংলাদেশে—আমাদের সঙ্গে ধুলোয় বসে কাদামাটির খেলা খেলবে বলে ? তাই হোক—তাই খেলো ! যে ভাবে তোমার ইচ্ছে হয়েছে, তুমি সেই ভাবেই খেলো।

বিবেকানন্দ ॥ ধন্য জি. সি., তুমিই ধন্য! তুমি আজ আমায় চোখ খুলে দিলে। আজ বুঝলাম গুরুকে আমরা ভালবাসি না, ভক্তি করি। কিন্তু তুমি ওঁকে বেঁধেছ ভালবাসায় বাঁধনে—ফেলেছ ভালবাসার দায়ে। ধন্য জি. সি.—ধন্য তুমি!

গিরিশচন্দ্র ॥ (তন্ময় হয়ে) গুরু কল্পতরু,
অহেতুকী কৃপার আধার।
এত কৃপা সন্তানে তোমার
মহাকষ্ট করি অঙ্গীকার
সহি তিরস্কার
এসেছ মঙ্গলদাতা, মঙ্গলপ্রদানে
চলো দেব, কোথা লয়ে যাবে মোরে।

রামকৃষ্ণ ॥ ওরে, এবার বাড়ী চল্। আয় রে, তোরাও আয়। কাল রাত্তিরে মা আমায় একটা গপ্পো বলে দিয়েছে, সেইটে গিরিশকে থ্যাটারের জন্যে লিখতে হবে—মা বলে দিয়েছে।

[সবাই অগ্রসর হলেন, সব শেষে গিরিশচন্দ্র চলেছেন]

গিরিশচন্দ্র ॥ (মহাধ্যানে ডুবে গেছেন, চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে, হাতদুটি জোড় করে) রামায় রামচন্দ্রায় রাম ভদ্রায় বেধসে রঘুনাথায় নাথায় সীতয়া পতয়ে নমো নমঃ ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রহ্মণ হিতায়ঃ চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায়ঃ নমো নমঃ। অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ।

[সকলের সঙ্গে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিনোদিনীর বাড়ী।

কথা বলতে বলতে জীবন ও জুড়নের প্রবেশ।

জুড়ন ॥ আরে দূর, দূর, দূর! এ জীবনে ঘেন্না ধরে গেছে আমার! তুই আমার একটু কাছে কাছে থাকিস জীব্‌নে।

জীবন ॥ কেন?

জুড়ন ॥ ফস্‌ করে যদি আত্মহত্যা করে ফেলি, তাহ'লে পৃথিবীর খুব ক্ষতি হয়ে যাবে।

জীবন ॥ কেন? আত্মহত্যা করবি কেন?

জুড়ন ॥ করবো কেন? ঠিক আছে—এ পর্যন্ত কাউকে বলিনি। তাহ'লে তোকেই বলি কথাটা। জীব্‌নে, আমার পৌরুষে ঘা লেগেছে।

জীবন ॥ সে কি রে জুড়ন? তোর ওই—পাথুরে পৌরুষে কে ঘা দিলে ভাই?

জুড়ন ॥ যে দিতে পারে। এই বিল্বমঙ্গল নাটকখানা শোনা এস্তোক,—আমার মনে মনে খুব ইচ্ছে ছিল যে মরি বাঁচি—একবার ভিক্ষুকের পার্টটার জন্য চেষ্টা করবো। অঘোর পাঠক করবে সেই পার্ট। গাইয়ে মানুষ। কিন্তু আমিও তো গাইয়ে। কম্‌তি যাই কিছু?

জীবন ॥ না।

জুড়ন ॥ তবে? চুপি চুপি গিয়ে বেলবাবুকে মনের কথাটা বললুম। উনি তো হেসেই খুন। বললেন—অমর্ত মিত্তিরকে বল্‌গে যা। তাঁর ওপরেই এই বইটার ভার। ভয়ে ভয়ে গেলুম। বলেও ফেললুম কথাটা। লোকটা মিট্‌মিটে, কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন—খুব ভাল কথা। ভিক্ষুকের শুদ্ধ উচ্চারণ কী বলো তো? বললুম—ভিসকুক।

জীবন ॥ ভিসকুক কী রে?

জুড়ন ॥ তবে কী?

জীবন ॥ ভিক্ষুক।

জুড়ন। একই কথা। ও ভিস্‌কুক্‌ও যা, ভিক্ষুক্‌ও তাই। ত্থাখ্‌ জীব্‌নে—আমায় সমস্কৃত শেখাস্‌নি। আমার বাবা সমস্কৃতের পণ্ডিত ছেলো ইস্কুলে।—বুঝলি?

জীবন ॥ বুঝেছি। তারপর কী হলো—বল্‌।

জুড়ন ॥ ভিস্‌কুক্‌ শুনে অমর্ত মিত্তির বললে—খুব ভাল। এবার বিল্বমঙ্গল বানান করতো বাপু! শোন্‌ একবার কথাটা। বলি আমি থিয়েটার করি, না পাঠশালায় পড়ি? আর শালার বিল্বমঙ্গল বানানটা এমন খিচির-মিচির যে সব গুলিয়ে গেল আমার। চোখের সামনে অক্ষরগুলো যেন নাচতে লাগলো। কিন্তু তাতে আমি দমবার ছেলে নই। করলুম বানান।

জীবন ॥ কী করলি?

জুড়ন ॥ বয়ে দীর্ঘি—লয়ে ময়ে একার—গায়ে অনুস্বার আর ল।

জীবন ॥ সাবাস্‌।

জুড়ন ॥ এই জানবি। কিন্তু কী বললে অমর্ত মিত্তির জানিস্‌?

জীবন ॥ কী বললেন?

জুড়ন ॥ বললে—বাবা, তোমার সঙ্গে বিনোদিনী চিন্তামণি করতে পারবে না। ভয় পেয়ে যাবে। বললুম—একথা যখন বলছেন, তখন থাক্‌। তাহলে আমাকে বিল্বমঙ্গলটা দিন। পার্ট করে,—একবার দেখিয়ে দিই। আর কতকাল দূত আর দৌবারিকের পার্ট করবো? বললে—বাবা, তুমি বিল্বমঙ্গলের পার্ট করলে অডিয়েন্স বারে বারে প্লে থামিয়ে তোমাকে মেডেল দেবে,—তাতে তো অনেক দেরী হয়ে যাবে। তবে হ্যাঁ, তোমার প্রতিভা আমি দেখে রাখলুম,—গিরিশবাবু এলেই তোমার কথা বলবো।

জীবন ॥ আর গিরিশবাবু! লোকটার বারোটা ওই রামকেষ্ট ঠাকুরই বাজালে।

জুড়ন ॥ কেন?

জীবন ॥ কেন কা রে? এখন তো থিয়েটারের দিকে আসেনই কম। শুধু বিল্বমঙ্গল খোলার দিন রামকেষ্টর সঙ্গে দেখেছিলুম। শুনি নাকি—যখন তখন চলে যান দক্ষিণেশ্বরে।

জুড়ন ॥ আমার খুব ইচ্ছে ছিল জীবনে বিনোদিনীর সঙ্গে বিল্বমঙ্গলটা একবার করি। বড্ড ভাল পার্ট করে মেয়েটা মাইরি!

জীবন ॥ কিচ্ছু হবে না,—কিচ্ছু হবে না, কিচ্ছু হবে না থিয়েটার করে। তার চাইতে চল্—আমাদের এঁড়েদার বাগানবাড়িতে গিয়ে একটা আশ্রম খুলি। আমি সাজবো গুরু, তুই চ্যালা। আমার নাম হবে মৌনিবাবা শ্রীহংসপরমানন্দ। লোকজন কিছু জিজ্ঞেস করলে—আমি একটা আঙুল তুলবো। তুই বলবি—বাবা বলছেন এক ব্রহ্ম, দ্বিতীয় নেই। কাউকে বা দুটো আঙুল দেখাবো। তুই বলবি—পুরুষ প্রকৃতি।

কথা বলতে বলতে বিনোদিনীর প্রবেশ।

বিনোদিনী। না মহামায়া, তোমার কথা আমি বিশ্বাস করলাম না। কেননা—একি! মহামায়া! ম-হা—! ও, আপনারা যাননি এখনো?

জুড়ন ॥ না। নিজেরা একটু আলোচনা করছিলাম। এবার যাই।

বিনোদিনী ॥ আসুন। মিত্তির মশায়কে বলবেন আমার জন্য ব্যস্ত না হতে। সেদিন বিল্বমঙ্গলের লাষ্ট সিনে মাথাটা হঠাৎ ঘুরে উঠেছিল বলে পড়ে গিয়েছিলাম। ও ঠিক হয়ে গেছে।

জীবন ॥ তাই বলবো। আয় জুড়ন!　　[জুড়নসহ প্রস্থান।

মহামায়ার প্রবেশ।

বিনোদিনী ॥ আমি মনে করলাম তুমি আমার সঙ্গেই আসছো। ওমা! হঠা দেখি তুমি নেই। কোথায় লুকিয়েছিলে?

মহামায়া ॥ না না, লুকোব কেন? লোক দুটোকে দেখে একটু সে গিয়েছিলাম। তোমাদের মুখ দেখাই বলে সবাই কি আমার মুখ দেখবে নাকি? না, দেখতে চাইলেই পাবে?

বিনোদিনী ॥ পাবে না?

মহামায়া ॥ না না, অত সস্তা নয়। তুমি খুব ভাল মেয়ে, তাই তোমা কাছে আসি, বসি, গল্প করি, চলে যাই।

বিনোদিনী ॥ তা যেন হল। কিন্তু তুমি তো আমার কাছে সত্যি কথ বলোনি মা!

মহামায়া ॥ মিথ্যে কথা কী বলেছি বলো?

বিনোদিনী ॥ মোড়ের মাথার ভট্‌চায্যি মশায়ের কাছে সেদিন খবর নিয়েছি —তুমি তো ও-বাড়ীতে থাকো না মা!

মহামায়া ॥ কোন্ বাড়ীর ভট্‌চায্যি মশায়?

বিনোদিনী ॥ কেন? ওই মোড়ের মাথায় যে বাড়ীতে শিব আর কালী মন্দির আছে—

মহামায়া ॥ হায় আমার পোড়া কপাল! বললাম কি, আর শুনলে কী আমি কি এই গলির মোড়ের মন্দিরের কথা বলেছি?

বিনোদিনী ॥ তবে?

মহামায়া ॥ ওই যে বড় রাস্তার মোড়ে গাঁজাখোর ঠাকুরের মন্দির আছে— আমি তো ওইখানে থাকি।

বিনোদিনী ॥ তুমি এই মন্দিরে থাকো না?

মহামায়া ॥ না না। এই মন্দিরের ভট্‌চায্যি শুধু কথার ভট্‌চায্যি। আমি

ওই বড় রাস্তার মোড়ের মন্দিরে থাকি। কি রে! তোর বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? আচ্ছা, বেশ তো! এই তো সামনেই কালীপূজো। ও-বাড়ীর সরকার নিশ্চয় তোর কাছে চাঁদা চাইতে আসবে। তখন জিগ্যেস্ করে জেনে নিস্—মহামায়া বলে ও মন্দিরে কেউ থাকে কি না।

বিনোদিনী ॥ বেশ। কিন্তু তখনো যদি শুনি যে—ও নামে কেউ থাকে না, তাহ'লে?

মহামায়া ॥ তাহ'লে—তুই দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে আমায় খুব বকে আসিস।

বিনোদিনী ॥ দক্ষিণেশ্বরে?

মহামায়া ॥ হ্যাঁ রে—আজই আমরা দক্ষিণেশ্বরে চলে যাচ্ছি।

বিনোদিনী ॥ ঠিকানা কি?

মহামায়া ॥ কেন? দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির! আমার কর্তার এই বড় দোষ জানিস? কাজ-কম্মো কিছুই করবে না। খালি আমায় নিয়ে মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে বেড়াবে। কোথাও দুদিন, কোথাও দশদিন—এই ভাবে ঘুরে বেড়াবে।

বিনোদিনী ॥ কি করেন তিনি?

মহামায়া ॥ কিছু না মা! কিছু না। খালি বসে বসে গাঁজা খেতে দাও—সিদ্ধি বেঁটে দাও—খুব আনন্দ। তবে কাল রাত্রে আমাকে বলেছে—এখন থেকে দক্ষিণেশ্বরেই থাকবে। গঙ্গার ধারের ওই জায়গাটায় নাকি ওর শরীর ভাল থাকে। কুড়ের বাদশা একেবারে। জ্বলে মরলাম মা! তাইতো মাঝে মাঝে ওকে বলি—স্বামীর মুখে আগুন তো বলতো নেই, তাই বলছি—তোমার কপালে আগুন! ছ'টা মাস যদি কোন মন্দিরে তিষ্ঠিয়ে থাকতে পারে মা। আয় না একদিন মন্দিরে।

বিনোদিনী ॥ যাব। কোথায় পাবো তোমাকে?

মহামায়া ॥ একটু ডাকাডাকি করিস্। তাহলেই শুনতে পাব।

বিনোদিনী ॥ আচ্ছা।

নেপথ্যে ত্রিলোচন ॥ মা কি বাড়ীতে আছেন?

মহামায়া ॥ ওই দ্যাখ্—বলতে-না-বলতেই সেই মন্দিরের সরকার মশায় এসেছে চাঁদা নিতে। ওকেই জিগ্যেস্ করে ত্থাখ্—মহামায়া বলে কোন মেয়ে ওদের মন্দিরে থাকে কি না!

বিনোদিনী ॥ তা জানছি, কিন্তু তুমি যাচ্ছো কোথায়?

মহামায়া ॥ আমি ওই থামের পাশটায় লুকিয়ে থাকি। আমাকে এখানে দেখলে হয়তো বলবে—এরা স্বামী-স্ত্রীতে মন্দিরে বাস করে আরামে ভোগ খাচ্ছে—আর পাড়ায় পাড়ায় টো-টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ নিন্দে করলে আমার ভারী খারাপ লাগে।

[দ্রুত প্রস্থান।

নেপথ্যে ত্রিলোচন ॥ মা!

বিনোদিনী ॥ আসুন বাবা।

প্রৌঢ় ও সৌম্য ত্রিলোচন সরকারের প্রবেশ।

ত্রিলোচন ॥ বড় মন্দিরের চাঁদাটা নিতে এসেছি মা।

বিনোদিনী ॥ হ্যাঁ, দিচ্ছি। ওই বড় রাস্তার মোড়ের মন্দির তো?

ত্রিলোচন ॥ হ্যাঁ, মা। প্রতি বছর আপনি দশ টাকা দেন।

বিনোদিনী ॥ এবারও তাই দেব। কিন্তু বাবা—আমার একটা কথা জানবার আছে।

ত্রিলোচন ॥ বলুন মা! গেল বছর প্রসাদ আমি নিজে এসে দিয়ে গিয়েছি।

বিনোদিনী। না, প্রসাদ নয়। আমি জানতে চাই—আপনাদের মন্দিরে কি মহামায়া বলে কোন মেয়ে থাকে?

ত্রিলোচন ॥ মহামায়া বলে মেয়ে? কই, না তো!

বিনোদিনী ॥ একটু ভাল করে মনে করে দেখুন। শ্যামলা রং, মুখখানি ভারী মিষ্টি। কটু কটু করে কথা বলে। সে কিন্তু একা থাকে না, তার স্বামীশুদ্ধ থাকেন আপনাদের মন্দিরে।

ত্রিলোচন ॥ স্বামী নিয়ে থাকে শ্যামলা রংয়ের মেয়ে আমাদের মন্দিরে—না মা।

বিনোদিনী ॥ আজই কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে চলে যাবার কথা। মনে করতে পারছেন না? একটু ভাল করে ভেবে দেখুন না! বলেছিল, তার স্বামী খুব গাঁজা খায়।

ত্রিলোচন ॥ মা, আপনি যা বলছেন—তাতে আমার শুধু একটা কথাই মনে হচ্ছে। আমি একটি শ্যামলা মেয়ের কথা জানি, তাঁর স্বামীও খুব গাঁজা খান, এবং তাঁরা আমাদের ওই মন্দিরেই থাকেন বটে।

বিনোদিনী ॥ তবে যে আপনি বললেন বাবা, যে—

ত্রিলোচন ॥ আমার কথা শেষ হয়নি মা। একটি শ্যামলা রংয়ের মেয়ে আমাদের মন্দিরে আছেন। তিনি ওই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী—কালী। তাঁর নামও মহামায়া।

বিনোদিনী ॥ (স্তম্ভিত হয়ে) আপনাদের কালীর নাম—মহামায়া? (মূর্ছা)

ত্রিলোচন ॥ কী আশ্চর্য! তবে কি এই অভিনেত্রী সাক্ষাৎ দর্শন পেয়েছে মায়ের? নইলে এমন ক'রে খোঁজ নিচ্ছে কেন? এই পতিতাকে এত কৃপা করেছেন কৃপাময়ী? যাই—সকলকে বলি গিয়ে।

[প্রস্থান।

বিনোদিনী ॥ (মূর্ছাভঙ্গে উঠে) মা, এমনি করে মেয়েকে ছলনা করে গেলে? যদি কৃপা করে দেখাই দিয়ে গেলে মা, তবে আমাকে ডাক দিলে না কেন তোমার সেবা করতে?

নেপথ্যে মহামায়া ॥ আয়! এখনো তো ডাকছি তোকে। আয় না—চলে আয়!

বিনোদিনী ॥ মা ! কোথায় যাব বলো মা ?

নেপথ্যে মহামায়া ॥ দক্ষিণেশ্বরে।

বিনোদিনী ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই যাব। দক্ষিণেশ্বরে আমার ঠাকুর আছেন, আমার ইষ্ট আছেন। আমি সেই খানেই যাব। আমায় পথ দেখাও মা ! নিয়ে চল আমাকে দক্ষিণেশ্বরে।

নেপথ্যে মহামায়া ॥ আয় ! আমি তোর সঙ্গেই আছি বিনোদিনী ! চলে আয়, সব ছেড়ে চলে আয় !

বিনোদিনী ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ। সব ছেড়েই যাব। চলো মা, এখুনি চলো।

(প্রস্থানোদ্যত)

নেপথ্যে গিরিশচন্দ্র ॥ বিনোদিনী !

বিনোদিনী ॥ কে ?

নেপথ্যে গিরিশচন্দ্র ॥ আমি তোমার শিক্ষক গিরিশ ঘোষ। কোথায় যাচ্ছো ?

বিনোদিনী ॥ আমি সংসার ত্যাগ করে চলে যাচ্ছি গুরু !

নেপথ্যে গিরিশচন্দ্র ॥ কিন্তু তোমার থিয়েটার ?

বিনোদিনী ॥ থিয়েটার ?

নেপথ্যে গিরিশচন্দ্র ॥ হ্যাঁ, তোমার থিয়েটার। তাকে তো তুমি ত্যাগ করতে পারো না বিনোদিনী !

নেপথ্যে মহামায়া ॥ বিনোদিনী চলে আয়।

নেপথ্যে ১ম কণ্ঠ ॥ যেও না বিনোদিনী ! থিয়েটার ছেড়ে তুমি যেও না।

নেপথ্যে ২য় কণ্ঠ ॥ বিনোদিনীর অভাবে শূন্য মঞ্চ—অন্ধকার হয়ে যাবে।

নেপথ্যে ৩য় কণ্ঠ ॥ কে মানুষকে হাসাবে, কাঁদাবে ? কে ভাসাবে তাদের আনন্দের বন্যায় ?

নেপথ্যে মহামায়া। আয় বিনোদিনী !

নেপথ্যে গিরিশচন্দ্র ॥ বিনোদ, বিনোদিনা ! যেও না। মানুষকে কাঁদিয়ে

দেবতার কাছে যেও না। তাতে দেবতাকেও পাবে না, মানুষকেও হারাবে।

[বহু কণ্ঠের কল-কোলাহল ভেসে এলো।]

বিনোদিনী ॥ না না না! থিয়েটারকে ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারবো না। থিয়েটার আমার সৃষ্টি। আমার দেহের বিন্দু-বিন্দু রক্ত দিয়ে ওর ভিত্তি,—আমার মনের সমস্ত প্রেম দিয়ে আমি অভিষেক করেছি। আমি যাব না। এই অপরাধে তুমি যদি রুষ্ট হও তো হবে মা। কিন্তু মঞ্চকে অন্ধকার করে, তার আলো নিভিয়ে দিয়ে, মানুষের নিঃশ্বাসের বোঝা মাথায় নিয়ে আমি মুক্তি চাই না। না না না—　　　[দ্রুত প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

থিয়েটারের লবি।

[দূর থেকে নহবতের আওয়াজ ভেসে আসছে।]

রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ ও রাম দত্তের প্রবেশ।

রামকৃষ্ণ ॥ জয় মা! জয় মা! আজ নতুন বই খোলা হবে কি না তাই রসুনচৌকি বাজছে। গিরিশের আমার ভাবটা ভাল। যা করে, তাইতেই কেমন যেন সাত্ত্বিক ভাবের ছোঁয়া লেগে যায়।

বিবেকানন্দ ॥ জি. সি.-কে আপনি সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন বলছেন? ও হল তমোগুণের রাজা। ওকে দিয়ে কী করে যে কী করাচ্ছেন, আপনিই জানেন।

রাম ॥ ভাই নরেন, যিনি পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করান, বোবাকে বাচাল করেন, তিনি তমোকে সত্ত্বঃ করবেন—এ আর বেশী কথা কী ভাই ?

অভেদানন্দ ॥ সেকথা ঠিক। গিরিশবাবুর আধারটি খুব ভাল।

বিবেকানন্দ ॥ তা তো বটেই কালি। নইলে আমাদের গুরুর কৃপা লাভ করে ?

রামকৃষ্ণ ॥ গিরিশ এখনো আসছে না কেন বলতো ?

রাম ॥ তাকে কি আপনি খবর দিয়েছিলেন যে আজ থিয়েটার দেখতে আসবেন ?

রামকৃষ্ণ ॥ না তো। খবর তো দেয়া হয়নি রে রাম। তাহলে কি হবে ? থ্যাটার দেখা হবে না আমাদের ?

বিবেকানন্দ ॥ তা কি বলা যায় ? আজ ওপনিং নাইট !

রামকৃষ্ণ ॥ সেটা কি ?

অভেদানন্দ ॥ আজ তো বই খোলার প্রথম দিন।

রামকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁরে, পেরথম দিন বলেই তো এলুম। পেরথম দিন থ্যাটার দেখতে আমার ভারী ভাল লাগে। ওই যে ভাল মুখস্থ হয়নি—একটু ভয়-ভয় ভাব—ওটা থাকা ভাল। বুঝলি ? থ্যাটার যাত্রা করাও তো সাধনা করা। এরাও সাধক। তাই বলছি, সাধনার গোড়ার দিকে সাধকের একটু ভয়-ভয় থাকা ভাল। কোন বিষয়ে 'মেরে দিয়েছি' ভাবটা ভাল নয়। তারপর কি জানিস ? পনেরো বিশ দিন করার পর জলের মত মুখস্থ হয়ে যায়। তখন গড়গড় করে বলে যাবে। সেটা যেন নিতান্তই থ্যাটার হয়ে যায়।

রাম ॥ তা বটে।

রামকৃষ্ণ ॥ রাম, তুই আমার কথাটা বুঝেছিস ?

রাম ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

রামকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁ, মোদ্দা কথাটা হচ্ছে এই। কিন্তু রাম, গিরিশকে একটু খবর দে বাবা। বলে পাঠা যে, আমরা এসেছি।

দ্রুত জীবনের প্রবেশ।

বিবেকানন্দ ॥ ও মশায়, আপনি ভেতরে যাচ্ছেন ?

জীবন ॥ হ্যাঁ।

বিবেকানন্দ ॥ একবার গিরিশবাবুকে পাঠিয়ে দেবেন ?

জীবন ॥ কেন ?

বিবেকানন্দ ॥ বলবেন, ঠাকুর এসেছেন থিয়েটার দেখবেন বলে।

অভেদানন্দ ॥ তিনি দাঁড়িয়ে আছেন।

জীবন ॥ একটা কথা বলি মশায়, কিছু মনে করবেন না। গিরিশবাবুর মাথাটা এইভাবে খাচ্ছেন কেন ?

বিবেকানন্দ ॥ খাওয়া হয়ে গেছে—এখন আর বলে কোন লাভ হবে না।

জীবন ॥ ও! হিউমার করলেন বুঝি ?

বিবেকানন্দ ॥ কী মনে হচ্ছে ?

রাম ॥ দেখুন, তর্ক করে কোন লাভ নেই। আপনাকে খবর দিতে বলা হল, দয়া করে খবরটা দিয়ে দিন।

জীবন ॥ পারবো না। যত সব ভণ্ড বিটলে সাধুর ভীড় হয়েছে দেশে!

অভেদানন্দ ॥ মুখ সামলে কথা বলবেন!

রামকৃষ্ণ ॥ ওরে, তোরা যে ঝগড়া আরম্ভ করলি! থাম্ থাম্—

জীবন ॥ সাধু! যে সাধু রোজ রোজ এসে থিয়েটারে বসে থাকে—সে আবার সাধু কিসের মশায় ?　　[প্রস্থান।

রামকৃষ্ণ ॥ জয় মা! জয় মা! দেখলি রাম, মা, এক-একজনের মুখ দিয়ে কি রকম বলিয়ে দেয়!

বিবেকানন্দ ॥ আমার মনে হয় আমাদের চলে যাওয়া উচিত।

অভেদানন্দ ॥ আমারও তাই মনে হয়।

রামকৃষ্ণ ॥ তোদের বড্ড রাগ দেখছি। ও রাম, ক্রোধ দমন করতে পারছে না—এরা কি করবে বল্‌তো!

রাম ॥ ওটা কিছু নয়। গুরুর অপমানে শিষ্যের রাগ হওয়াই স্বাভাবিক।

শিস্‌ দিতে দিতে জুড়নের প্রবেশ।

রাম ॥ ও মশায়! আপনি কি ভেতরে যাচ্ছেন?

জুড়ন ॥ কেন, আপত্তি আছে?

রাম ॥ না না, আপত্তি কেন থাকবে? আপনিও একজন অভিনেতা বুঝি?

জুড়ন ॥ (জামার গিলে সামলে) হ্যাঁ। কেন? আমাকে দেখে কি সেটা বোঝা যাচ্ছে না?

রাম ॥ বোঝা যাচ্ছে বলেই তো আপনাকে ডাকলুম।

জুড়ন ॥ বলুন।

রাম ॥ একবার গিরিশবাবুকে খবর দিতে পারেন? বলবেন—ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন।

জুড়ন ॥ (ভাল করে দেখে) রামকেষ্ট বুঝি?

বিবেকানন্দ ॥ রামকেষ্ট নয়—শ্রীরামকৃষ্ণ।

জুড়ন ॥ ওই হল। চিঁড়ের ভাল নাম চিপিটক। ক'জন চিপিটক বলে? সবাই চিঁড়েই বলে।

রামকৃষ্ণ ॥ (হা-হা করে হেসে উঠলেন, যেন খুব আনন্দ পেয়েছেন) বেশ বাবা, বেশ। ভারী সুন্দর বলেছ কথাটা। গিরিশের চ্যালা তো! বড় ভাল কথা কয় এরা।

জুড়ন ॥ (কাছে এসে) আপনি হাত দেখতে জানেন?

রামকৃষ্ণ ॥ না বাবা।

জুড়ন ॥ মাইরি, আমি ঠাট্টা করছি না। আমার হাতটা দেখে একটু বলে

দিন না কবে আমি হিরোর পার্ট পাবো। শুনুন না। হাসছেন কেন? লেখাপড়ার দিকটায় আমি একটু কমজোরী আছি, বুঝেছেন? শালারা যেন সেই গুমোরে ম'লো। কিন্তু ক'জনের মধ্যে এপিডেমিক কোয়ালিফিশেন থাকে বলুন তো?

রামকৃষ্ণ ॥ ঠিক—ঠিক!

অভেদানন্দ ॥ আপনি যে মশায় একটা অদ্ভুত ইংরেজী বললেন। এপিডেমিক নয়, অ্যাকাডেমিক—আর কোয়ালিফিশেন নয়, কোয়ালিফিকেশন।

জুডন ॥ ও! আপনিও দু'পাতা ইংরিজী লড়িয়েছেন বুঝি?

(রাম, বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ সবাই জোরে হেসে উঠলেন।)

কথা বলতে বলতে ধর্মদাস সুর ও গিরিশচন্দ্রের প্রবেশ।

[ইঙ্গিতে ঠাকুরকে তার কপাল ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে
[জুডনের প্রস্থান।

রামকৃষ্ণ ॥ এই তো গিরিশ এসে গেছে।

গিরিশচন্দ্র ॥ (রামকৃষ্ণের কথায় কান না দিয়ে ধর্মদাসের সংগে গভীরভাবে আলোচনা চালিয়ে যেতে লাগলেন) আমি কথাটা কি বলতে চাই—তুমি বুঝেছো ধর্মদাস?

ধর্মদাস ॥ হ্যাঁ। তুমি তো বলছো ষ্টলের সীট্‌গুলো আরও বাড়িয়ে দিতে?

গিরিশচন্দ্র ॥ শুধু স্টলের সীট বাড়ানোই নয়—হাউস-ভ্যালু—

রামকৃষ্ণ ॥ গিরিশ রে, আমরা এসেছি।

গিরিশচন্দ্র ॥ হ্যাঁ, দেখেছি। (ধর্মদাসকে) হাউস-ভ্যালু, বুঝেছ ধর্মদাস, হাউস-ভ্যালু বাড়াতেই হবে। তাতে যদি একটু-আধটু ওলট-পালট করতে হয়—করতে হবে। কেননা, আজ যে রকম রাশ্—

রামকৃষ্ণ ॥ ওরে গিরিশ, আমাদের বসিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর।

গিরিশচন্দ্র ॥ টিকিট কাটুন—তাহলেই বসার ব্যবস্থা হবে। (ধর্মদাসকে

আজ যে রকম রাশ্—এটা খুবই ভাল লক্ষণ। এইভাবে যদি চলে, তবে বইটাকে আমরা সুপার হিট্ বলে ধরে নেবো।

রামকৃষ্ণ ॥ গিরিশ, আমরা সাধু-সন্ন্যিসী মানুষ—টিকিট কাটবো কি করে ?

(গিরিশ একথায় যেন কোন কানই দিলেন না। ধর্মদাসের সংগে চুপি চুপি কথা বলতে লাগলেন।)

বিবেকানন্দ ॥ কি ব্যাপার রামবাবু ? জি. সি. তো ঠাকুরকে ডাউন-রাইট ইন্সাল্ট্ করছে! (ক্ষোভে) আমি এত করে ওঁকে বললাম যে থিয়েটারের লোকদের মতেরও ঠিক নেই—পথেরও ঠিক নেই। সবটাই মদের খেয়াল।

অভেদানন্দ ॥ কি করে ঠাকুরকে এই অপমান থেকে বাঁচাই এখন ?

রাম ॥ দেখই না, ঠাকুর কি করেন!

রামকৃষ্ণ ॥ তোরা অপমানের কথা বলছিস কেন রে ? অপমান কেন করবে ? সত্যিই তো বাপু—কাজের মানুষ, কত কাজের চাপ ওর মাথায়, কতো রকম ভাবনা একা একা ভাবতে হয় ওকে। একটু দাঁড়া না—মায়ের ইচ্ছায় সব ঠিক হয়ে যাবে।

বিবেকানন্দ ॥ আর ঠিক হয়ে কাজ নেই। আপনি চলুন।

রামকৃষ্ণ ॥ নরেন, তোকে সেদিনও বলেছি, আজও বলছি—কখনো গেরস্তর বাড়ী থেকে খালি হাতে রাগ করে ফিরে যাবিনে। যদি গালাগালি দেয়, অপমান করে, তবে তাই তোর ভিক্ষের ঝুলিতে ভরে নিয়ে 'তোমাদের মঙ্গল হোক' বলে আশীর্বাদ করে ফিরে যাবি।

বিবেকানন্দ ॥ অতটা মনের বল আমাদের নেই। আপনি পতিত-পাবন—ও কাজ আপনার দ্বারাই সম্ভব।

রামকৃষ্ণ ॥ তোরও হবে, তোদেরও হবে। মা কি সব সময় সোজা রাস্তায় মানুষকে নিয়ে যান ? তাড়াতাড়ি থাকলে ব্যাঁকা পথ দিয়েই নিয়ে গিয়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেন। [ধর্মদাসের প্রস্থান।

গিরিশচন্দ্র ॥ (ঠাকুরের দিকে ফিরে) বলুন।

রামকৃষ্ণ ॥ আমরা চারজন এসেছি। আমাদের বসিয়ে দে।

গিরিশচন্দ্র ॥ বললুম যে টিকিট কাটুন।

রামকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁ রে, তুই তো আচ্ছা মজার কথা বলছিস! আমরা সাধু-সন্ন্যিসী মানুষ—টিকিট কাটবো কি করে?

গিরিশচন্দ্র ॥ থিয়েটার তো আমার মামার বাড়ীর সম্পত্তি নয় যে বিনা টিকিটে ঢুকিয়ে দেবো!

বিবেকানন্দ ॥ তোমাকে ঢোকাতে হবে না জি. সি.। তুমি আর কষ্ট ক'রো না—আমরা চলে যাচ্ছি।

গিরিশচন্দ্র ॥ তা কি করবো ভাই? এটা লিমিটেড কনসার্ন। আন্‌লিমিটেড কিছু করার ক্ষমতা আমার নেই।

অভেদানন্দ ॥ থেকেও দরকার নেই। (ঠাকুরকে) হয়েছে তো? এবার চলুন।

রামকৃষ্ণ ॥ তোরা এ রকম করছিস কেন বল্‌তো? হচ্ছে আমার সঙ্গে কথা। ত্যাখ তো, রাম কেমন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তোরা কি স্থির হতেও শিখবিনে? জয় মা! জয় মা! তা হ্যাঁ রে গিরিশ, কত পয়সা লাগবে টিকিট কাটতে? তাহ'লে এক কাজ কর। চার পয়সা করে নিয়ে একটা সিকিতে আমাদের চারজনের বসার ব্যবস্থা করে দে।

গিরিশচন্দ্র ॥ এক সিকিতে একজনেই ঢুকতে পায় না—চারজনকে ঢোকাব কি করে?

রামকৃষ্ণ ॥ তাহ'লে কি হবে রাম? গিরিশ বলছে চার পয়সা করে হবে না। তবে এক কাজ কর্ গিরিশ—দু' গণ্ডা করে—আট গণ্ডা পয়সা নিয়ে আমাদের থ্যাটারটা দেখিয়ে দে বাবা! রাম, গেঁজেটা বার কর। গিরিশকে পয়সাটা দে বাবা!

বিবেকানন্দ ॥ উঃ!

রামকৃষ্ণ ॥ (চেয়ে) কি হল রে ? শরীর খারাপ করছে না তো ?

বিবেকানন্দ ॥ না।

গিরিশচন্দ্র ॥ আট আনায় হবে না ঠাকুর। থিয়েটারের একটা রেট্ আছে তো! (হঠাৎ বিচলিত হয়ে) নাঃ, ষোল আনা হাতে না পেলে আমি থিয়েটার দেখাতে পারবো না।

রামকৃষ্ণ ॥ ছাখ তো রাম, এক্ষুনি হাতে হাতে ওকে ষোল আনা দিই কি করে আমি ?

গিরিশচন্দ্র। তা জানি না। তবে আমাকে ষোল আনাই দিতে হবে।

রামকৃষ্ণ ॥ রাম, ছাখ গেঁজেটা খুলে—ষোল আনা হয় কি না। হ্যাঁ রে গিরিশ, দু' এক পয়সা কম হলে ঢুকতে দিবি তো ?

গিরিশচন্দ্র ॥ আগে গোনা শেষ হোক—তারপর বলবো।

[রাম পয়সা গুনতে লাগলো। বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ ছটফট করছেন অপমানের জ্বালায়। নেপথ্যে ফার্ষ্ট বেল বাজলো।]

রামকৃষ্ণ ॥ ও কি রে! ঘণ্টা বাজছে কেন ? থ্যাটার হয়ে গেল নাকি ?

গিরিশচন্দ্র। না না। তুমি না গেলে আরম্ভ হবে না।

রামকৃষ্ণ ॥ তাই বল বাবা। কি হল রে রাম ?

রাম ॥ এই যে হয়ে গেছে। কুড়িটা ডবল পয়সা—ন'টা পয়সা আর ত্রিশটা আধলা—

রামকৃষ্ণ ॥ অত হিসেবের দরকার কি ? ষোল আনা হয়েছে কি ?

রাম ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

রামকৃষ্ণ ॥ ব্যস! গিরিশকে দিয়ে দে। নে গিরিশ, তোর কথাই থাকলো। ষোল আনাই তোকে দিলুম।

গিরিশচন্দ্র ॥ (উন্মাদের মতো) দাও, দাও—শীগ্‌গির দাও।

রামকৃষ্ণ ॥ এবার তাহ'লে আমাদের বসিয়ে দে।

গিরিশচন্দ্র ॥ হ্যাঁ। কে আছিস রে ?

একজন গেট-কীপারের প্রবেশ।

গেট-কীপার ॥ কি বলছেন স্যার ?

গিরিশচন্দ্র ॥ শোন ! ভেতর থেকে সোফাসেট এনে—একেবারে ফ্রণ্ট রো-তে এঁদের নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দাও। একজনকে একখানা বড় পাখা নিয়ে পেছনে দাঁড়িয়ে এঁদের বাতাস করতে বল। আমি গিয়ে পাখা ধরলে তবে যেন সে যায়। নরেন, কালি, রাম, ঠাকুরকে তোমরা ভেতরে নিয়ে যাও ভাই !

রামকৃষ্ণ ॥ (যেতে যেতে) দেখলি তো, ষোল আনা হাতে পেতেই কেমন সব ব্যবস্থা করে দিলে ! সত্যিই তো বাপু—এ তো ওর নিজের জিনিস নয়, টিকিটের দাম না পেলে বসায় কী করে ? রাম, তাহ'লে ফিরে যাওয়ার গাড়ীভাড়া আর রইলো না ?

(গিরিশ ভাবাবেশে অল্প অল্প টলছেন।)

রাম ॥ আজ্ঞে না।

রামকৃষ্ণ ॥ ঠিক আছে, ঠিক আছে—মায়ের নাম করতে করতে হেঁটেই চলে যাব দক্ষিণেশ্বরে, কি বলিস ?

রাম ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

[গিরিশচন্দ্র ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বিবেকানন্দের পুনঃ প্রবেশ।

গিরিশচন্দ্র ॥ (গিরিশের পায়ের ধুলো নেবার জন্য বিবেকানন্দ হেঁট হতেই তাকে ধরে ফেললেন।) করছো কি নরেন ? মহাপাপ হবে যে আমার ! ছিঃ ছিঃ, যাও, ঠাকুরের কাছে গিয়ে বসো।

বিবেকানন্দ ॥ জি. সি., আজ অকপটে স্বীকার করছি, তোমাকে আমি চিনতে পারিনি। কিচ্ছু চিনতে পারিনি। আজ বুঝলুম, গুরু কাউকে

ষোল আনা দেন না। ষোল আনা এমনি করেই শোধ দিতে হয়। সাবাস জি. সি.! সাবাস! [প্রস্থান।

ধর্মদাসের পুনঃ প্রবেশ।

গিরিশচন্দ্র ॥ ও ধর্মদাস, শোন! তুমি একটু ভেতরে গিয়ে দাঁড়াও ভাই! ঠাকুর বসেছেন নাটক দেখতে। তাঁর যেন কোন অসুবিধে না হয়।

ধর্মদাস ॥ এক্ষুনি যাচ্ছি। (প্রস্থানোদ্যত)

গিরিশচন্দ্র ॥ আর শোন! এরপর কখন কি অবস্থায় থাকবো, মনে থাকবে কি না—ওঁদের যাবার সময় তুমি এই দশটা টাকা গাড়ীভাড়া বাবদ রাম দত্তর হাতে তুলে দিও ভাই।

ধর্মদাস ॥ আচ্ছা। [টাকা নিয়ে প্রস্থান।

গিরিশচন্দ্র ॥ (কিছুক্ষণ তাঁর হাতে ধরা পয়সাগুলোর দিকে চেয়ে রইলেন) ভিক্টোরিয়া মার্কা পয়সা দিয়ে এখানে স্ফূর্তি করি, মদ খাই—জুড়িগাড়ী হাঁকাই। কিন্তু সেখানে? সেই তরঙ্গসংকুল কল্লোলিনী বৈতরণীর মাঝি তো ভিক্টোরিয়া মার্কা পয়সায় আমাকে পার করবে না, তাই এই রামকৃষ্ণ মার্কা পারের কড়ি যোগাড় করে রাখলাম। কিন্তু এ আমি কি করলাম? টাকা মাটি, মাটি টাকা যাঁর জীবনের মন্ত্র, পয়সা ছুঁলে যাঁর হাত বেঁকে যায়, সেই তাঁর কাছ থেকে আমি পয়সা আদায় করলাম! বা রে আমি! বা রে আমি! (হঠাৎ উন্মত্তের মতো কেঁদে উঠে) ওরে, তোরা কে কোথায় আছিস—দেখে যা! একবার এসে দেখে যা! আমি ভগবানের কাছে টিকিটের দাম আদায় করেছি! ওরে, আমি ভগবানের কাছে টিকিটের দাম আদায় করেছি!

[কাঁদতে কাঁদতে দ্রুত প্রস্থান।

চতুর্থ অংক

প্রথম দৃশ্য

বিনোদিনীর বাড়ী।

কথা বলতে বলতে কালীতারা ও বিনোদিনীর প্রবেশ।

কালীতারা ॥ হ্যাঁরে বিনু, কী হয়েছে তোর?

বিনোদিনী ॥ কী আবার হবে?

কালীতারা ॥ না না, কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়। কাল থিয়েটারে অনেকেই বলাবলি করছিল।

বিনোদিনী ॥ কি বলছিলো?

কালীতারা ॥ সবাই বলছিল যে, তুই নাকি আস্তে আস্তে সন্ন্যিসী হয়ে যাচ্ছিস। মাছ মাংস ছেড়ে দিয়েছিস, একবেলা খাস, খাটে শুতে চাস না।

বিনোদিনী ॥ না না, তা কেন হবে? লোকের কথা বাদ দে। লোকে তো কত কিছুই বলে।

কালীতারা ॥ কিন্তু ভাই, যা রটে তা কিছুটা তো বটে। থিয়েটারে এসব কথা শুনে ছুটে এলাম। ভাবলাম আজ ইংরিজী বছরের শেষ দিন, কাল পয়লা জানুয়ারী। তোকে কিছু কমলালেবু আর মিষ্টি দিয়ে আসি। শুনে অবধি মনটা এত অস্থির হয়েছে—

বিনোদিনী ॥ কেন? মন অস্থির হবার কি আছে এতে?

কালীতারা ॥ নেই? তুই বলিস কি বিনু? কোলকাতার থিয়েটারে আজ তোর চেয়ে বড় অ্যাকট্রেস নেই। সাহেবরা পর্যন্ত তোর প্লে'র সুখ্যাত করে। এখন তোর উঠ্‌তি সময়। এরপর আরো কত নাম হবে, সম্পত্তি হবে, গাড়ী-বাড়ী হবে—

বিনোদিনী ॥ হ্যাঁ। সব হবে।

কালীতারা ॥ তার মানে? কালকে মুস্তাফী সাহেব পর্যন্ত কত দুঃখ করলেন। মুস্তাফী সাহেব আর দেবকণ্ঠবাবুতে কথা হচ্ছিল, আমি নিজের কানে শুনেছি।

বিনোদিনী ॥ কী কথা হচ্ছিল?

কালীতারা ॥ মুস্তাফী সাহেব দেবকণ্ঠবাবুকে বললেন—নতুন বইয়ের গানগুলো বিনোদকে তুলিয়ে দিন। দেবকণ্ঠবাবু বললেন—তুলিয়ে-দেব কাকে? বিনোদ দশটা মিনিটও স্থির হয়ে বসে না। সব সময় অন্যমনস্ক,—সব সময় ছট্‌ফট্ করছে। যেন কোন কাজেই ওর মন নেই। অত ভাল, অত কাজের মেয়ে, কিন্তু কী রকম যেন হয়ে গেছে।

বিনোদিনী ॥ সাহেব কী বললেন?

কালীতারা ॥ সাহেব বললেন—ধর্ম জিনিসটার মজাই ওই। ধরে না তো ধরে না, কিন্তু যাকে একবার ধরে, তার মধ্যে বড় রকমের একট ওলট-পালট ঘটিয়ে দেয়। শ্রীরামকৃষ্ণ থিয়েটারে এসে দুটি মাত্র মানুষকে ছুঁয়েছেন। একজন গিরিশবাবু, আর একজন বিনোদিনী দু'জনেরই অবস্থা দেখুন।

বিনোদিনী ॥ (হাত জোড় করে কপালে ঠেকালো।) তিনি পতিত পাবন, আমি পতিতা। তোকে সত্যি বলছি কালী, আমার মনে হচ্ছে—আমি যেন এতকাল ঘুমিয়ে ছিলাম। আচ্ছন্ন হয়ে ছিলাম গভীর ঘুমে। শুধু এই জন্মেই নয়—কত জন্ম, কত জন্মান্তর আমি যেন এইভাবে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েই যাওয়া-আসা করছি। যেমন করে পাথর হয়ে ঘুমিয়ে ছিল পাষাণী অহল্যা। এই ঘুমের মধ্যে দিয়ে কেটে গেছে কতো দিন, কতো রাত, কতো মাস, কতো বছর-কতো যুগ-যুগান্তর কাল-কালান্তর; তারপর একদিন এলেন-নয়নানন্দ রাম। স্পর্শ করলেন সেই পথের পাশে পড়ে-থাকা অনাদৃত

উপেক্ষিতা পাষাণীকে। বললেন—মা, তোর চৈতন্য হোক্! তুই জেগে ওঠ্! (ভাবাবেশে চোখ দুটি মুদ্রিত, দু' চোখে জলের ধারা।)

কালীতারা ॥ (ভয় পেয়ে) একি হল? বিনু! বিনু! কী করি আমি এখন! কাকে ডাকি? বিনু! বিনোদিনী—

বিনোদিনী ॥ (চোখ খুললো) পাষাণী বিনোদিনীর ঘুম ভেঙে গেল। সে চেয়ে দেখলো—এক আশ্চর্য জগতে সে ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে। এখানে আকাশে মধু, বাতাসে মধু, জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে মধু, এখানে মধুক্ষরা নদী আর মধুক্ষরা মানুষের কথা। আর দেখল, তার সামনে একটি মধুময় মানুষ—দেবতা রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে বলছেন—মা, তোর চৈতন্য হোক! কালী, এই চৈতন্য হবার লীলাই চৈতন্যলীলা।

কালীতারা ॥ গিরিশবাবু তোর এখানে আসেননি কতদিন?

বিনোদিনী ॥ কি জানি, দিনের হিসেব করিনি।

কালীতারা ॥ সেকি রে!

বিনোদিনী ॥ হ্যাঁ। কি হবে দিনের হিসেবে? তিনি তো আছেন। চব্বিশ ঘণ্টাই আমার কাছে কাছে আছেন। তিনি শিক্ষক, আমি ছাত্রী—তিনি গুরু, আমি শিষ্যা—তিনি প্রভু, আমি দাসী। তিনি সর্বদাই আমার মধ্যে থেকে আমায় নির্দেশ দিচ্ছেন।

কালীতারা ॥ অন্য লোকে তোর কথা শুনলে মনে করবে, তুই বোধহয় পাগল হয়ে যাচ্ছিস। কিন্তু না। আমি বুঝেছি বিনু তোর অবস্থাটা। জাত সাপে কামড়ালে এমনি হয়। কালকে পয়লা জানুয়ারী—প্লে'র কথা মনে আছে তো?

বিনোদিনী ॥ কী প্লে আছে কালকে?

কালীতারা ॥ বিল্বমঙ্গল, শংকরাচার্য আর বেল্লিকবাজার।

বিনোদিনী ॥ মনে ছিল না, এখন থাকবে।

কালীতারা ॥ তোর ওই বিল্বমঙ্গলেই পার্ট। তারপরেই বাড়ী চলে আসতে পারবি। আহা! বিনু, তোর চিন্তামণির যেন কোন তুলনা হয় না। সেই আমি যেখানে সাপ দেখার সিনে বলি—"একেই বলি টান, একেই বলি মনের মানুষ। নইলে হৃদে পোড়ারমুখো—খ্যাংরা মারি! খ্যাংরা মারি!"

(এই বলা মাত্র বিনোদ চিন্তামণির পার্ট বলতে লাগলো।)

বিল্বমঙ্গলের পার্ট বলতে বলতে গিরিশচন্দ্রের প্রবেশ।

(কালীতারা তাঁকে প্রণাম করে সরে গেল। গিরিশচন্দ্র ও বিনোদিনী দুজনেই তন্ময় হয়ে পার্ট বলে যেতে লাগলো।)

বিনোদিনী ॥ একি, তুমি কাল সাপ ধরে উঠেছিলে? তুমি আমার মুখের পানে চেয়ে রয়েছ যে?

গিরিশচন্দ্র ॥ তোমায় দেখছি চিন্তামণি।

বিনোদিনী ॥ কি দেখছ?

গিরিশচন্দ্র ॥ তুমি বড় সুন্দর।

বিনোদিনী ॥ তুমি নদী পেরুলে কী করে?

গিরিশচন্দ্র ॥ আমি নদীতে ঝাঁপ দিলুম। ভাবলুম, সাঁতারে পার হবো! কিন্তু বড় তুফান। মাঝখানে এসে ঢেউ লেগে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে লাগলো। এমন সময় একখানা কাঠ ভেসে যাচ্ছিল—

বিনোদিনী ॥ তোমার গায়ে অত দুর্গন্ধ কিসের?

গিরিশচন্দ্র ॥ তোমায় তো বলিচি, তা আমি বলতে পারিনি।

বিনোদিনী ॥ সাপটা অনায়াসে ধরলে?

গিরিশচন্দ্র ॥ চিন্তামণি! বোধহয় তুমি কখনো প্রাণ দাওনি, তাহলে বুঝতে—প্রাণ অতি তুচ্ছ। তাহলে জানতে—সাপেতে আর দড়িতে বিশেষ প্রভেদ নেই।

বিনোদিনী ॥ তুমি কি উন্মাদ ?

গিরিশচন্দ্র ॥ যদি আজও না বুঝে থাক, নিশ্চয় তুমি প্রেমিকা নও। কিন্তু তুমি সুন্দর, অতি সুন্দর।

বিনোদিনী ॥ কী ফ্যাল ফ্যাল করে দেখছো ?

গিরিশচন্দ্র ॥ দেখছি, তোমার কথা সত্য কি মিছে। আমি যে উন্মাদ এ পরিচয় কি তুমি আগে পাওনি ? তুমি নিদ্রা যাও, আমি সমস্ত রাত্রি তোমার মুখের পানে চেয়ে থাকি। তুমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে দশদিক শূন্য দেখি। তোমার চক্ষে জল পড়লে আমার বুকে শেল বাজে। এতেও কি বুঝতে পারনি আমি উন্মাদ কি না ?

বিনোদিনী ॥ আর আমার অবিশ্বাস নেই, লজ্জা নেই, ভয় নেই, তুমি দড়ি বলে সাপ ধরো, কাঠ বলে পচা মড়া ধরো—এই মন—আমি বেশ্যা—যদি আমায় না দিয়ে হরি-পাদপদ্মে দিতে, তোমার কাজ হতো। তোমায় আর অধিক কি বলবো! তুমি পচা মড়া ধরে রাত্তিরে নদী পার হয়ে এলে! দেখ, আমাদের সকলই ভান বোধ হয়। কিন্তু এ যদি ভান হয়, এমন ভান কিন্তু কখনো দেখিনি।

গিরিশচন্দ্র ॥ এই পরিণাম! এই নবদেহ জলে ভেসে যায়, ছিঁড়ে খায় কুক্কুর শৃগাল, কিম্বা চিতাভস্ম পবন উড়ায়। এই নারী! এরও এই পরিণাম। নশ্বর সংসারে তবে হায় প্রাণ দিচ্ছি কারে? (হঠাৎ থেমে) এটা হচ্ছে কি ?

বিনোদিনী ॥ (চমক ভেঙে) কেন, ভালই তো হচ্ছে। এই পার্টটা আপনি করলে কত ভাল হত বলুন তো ?

গিরিশচন্দ্র ॥ কেন ? অমৃতবাবু এ পার্টটা তো ভালই করেন।

বিনোদিনী ॥ হ্যাঁ। খুব ভালই করেন। কিন্তু আপনার গলার যাদু ওঁর গলায় নেই।

গিরিশচন্দ্র ॥ ওটা তোমার মনের ভুল। অমৃত মিত্রও খুব ভাল অভিনেতা।

স্টেজে নেমে অনেক ভাল ভাল পার্ট তিনি করেছেন, চরিত্র সৃষ্টি করেছেন।

বিনোদিনী ॥ ঠাকুরের কাছে গিয়েছিলেন এর মধ্যে ?

গিরিশচন্দ্র ॥ শুধু গিয়েছিলাম ? পরশু রাতে কী দুর্মতি হল, রাত ন'টার পর ভাবলাম, দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে গিয়ে একটু আনন্দ করে আসি। থিয়েটারের তিন-চারজন ব্যালে মেয়েকে বলে রেখেছিলাম —তোরা আমার সঙ্গে যাবি। ওরা তৈরী ছিল। এক বোতল খেয়ে ওদের সঙ্গে করে আরো দু' বোতল ব্রাণ্ডি নিয়ে একখানা নৌকো ভাড়া করে চললাম দক্ষিণেশ্বরে।

বিনোদিনী ॥ সর্বনাশ! আপনি মদ নিয়ে আর ওদের নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে গেলেন ?

গিরিশচন্দ্র ॥ গেলাম বৈকি বিনোদিনী। গিরিশ ঘোষ যাঁর ভক্ত, তাঁর সহ্যশক্তিটাও তো পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

বিনোদিনী ॥ তাই বলে ওদের নিয়ে—

গিরিশচন্দ্র ॥ নইলে ওরাই বা উদ্ধার হবে কেমন করে বিনোদ ? জীবনে কোনোদিন তো ওরা ঠাকুরের ত্রিসীমানায় যেতে পারবে না। থিয়েটারের ঐ শালাদের আর কেউ উদ্ধার করতে পারবে না, পারবে এই গিরিশ ঘোষ—তাও তো সে নিজে পারবে না, তার গুরুকে দিয়ে করাবে। তাই মনে মনে ভাবলাম, এই হতভাগীরা যদি কোনরকমে ঠাকুরের চরণ একটুখানি ছুঁতে পারে—ব্যস্! কয়েক জন্মের ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল।

বিনোদিনী ॥ তারপর কী হল ?

গিরিশচন্দ্র ॥ দক্ষিণেশ্বরে মায়ের বাড়ীর ঘাটে গিয়ে যখন নৌকো লাগলো, তখন রাত এগারোটা বেজে গেছে। গোটা বাড়ীটা ঘুমে নিঃঝুম। দুটো বোতল দু' বগলে আর পেছনে ওদের নিয়ে অঙ্গন দিয়ে হেঁটে

ঠাকুরের ঘরের কাছে পৌঁছালাম। একজন গুরুভাই বারান্দায় শুয়েছিল সে তাড়াতাড়ি উঠে আমার কাছে চাপা-গলায় বললো—কী চাই আপনার? বললাম—ঠাকুরের সঙ্গে ফুর্তি করতে চাই। ডাকো তাঁকে। সে মদের গন্ধ পেয়ে দু' হাত পিছিয়ে গিয়ে বললো—ছি ছি, এমন কাজ করবেন না। ঠাকুরের শরীর আজ খুব খারাপ। গায়ে জ্বর, গলায় ব্যথা, না খেয়ে সকাল সকাল শুয়ে পড়েছেন।

বিনোদিনী ॥ (চেঁচিয়ে) তবু কি ডাকলেন আপনি তাঁকে?

গিরিশচন্দ্র ॥ না, বিনোদ। মুহূর্তকালের জন্য আমার মনে দ্বিধা এসেছিল। চলে আসবো কি না ভাবছি—হঠাৎ ঠাকুরের ঘরের দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে এলেন ভগবান রামকৃষ্ণ।

নেপথ্যে রামকৃষ্ণ ॥ কে রে, গিরিশ নাকি রে?

গিরিশচন্দ্র ॥ হ্যাঁ গুরু, আমি।

নেপথ্যে রামকৃষ্ণ ॥ এসব কাদের নিয়ে এসেছিস?

গিরিশচন্দ্র ॥ এরা সব আমার থিয়েটারের সখীর দলের মেয়ে। তোমার সঙ্গে নেচে-গেয়ে আনন্দ করবো বলে এদের নিয়ে এসেছি।

নেপথ্যে রামকৃষ্ণ ॥ আনন্দ করবি? জয় মা! জয় মা! বা-বা, সে তো খুব ভাল কথা রে! কই গো মায়েরা, নাচো—গাও। আনন্দ হোক্—খুব আনন্দ হোক্!

গিরিশচন্দ্র ॥ মেয়েগুলোকে বলেছিলুম একটা চটুল গান গাইতে, ওরা ধরলো বিল্বমঙ্গলের সেই গান—

গীত।

নেপথ্যে নারীকণ্ঠ ॥ জয় বৃন্দাবন,　　জয় নবলীলা
জয় গোবর্দ্ধন,　　চেতনশীলা
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ!

চেতন যমুনা, চেতন রেণু,
গহন কুঞ্চনে ব্যাপিত বেণু
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ !

খেলা খেলা, খেলা মেলা,
নিরঞ্জন নির্মল ভাবুক ভেলা
নারায়ণ, নারায়ণ নারায়ণ !

গিরিশচন্দ্র॥ (গীত চলতে থাকে) বিনোদ, তারপর যে ঘটনা ঘটলো সে আমি তোমায় বোঝাতে পারবো না। সেই অসুস্থ শরীর নিয়ে ঠাকুর নাচতে আরম্ভ করলেন—গানে-নাচে মন্দিরপ্রাঙ্গণ উত্তাল, উদ্দাম হয়ে উঠলো। নেশা করবো কি, ঠাকুরের নেশা দেখে আমার নেশা ছুটে যেতে লাগলো। ঠাকুর নাচছেন, মেয়েরা নাচছে, আমি নাচছি। নাচের তালে তালে অপরূপ ভঙ্গিমায় ঠাকুরের শরীর দুলছে—দুলছে—দুলছে, দক্ষিণেশ্বর মন্দির দুলছে, হঠাৎ আমার মনে হল এই নাচের তালে তালে স্বর্গ দুলছে—মর্ত্য দুলছে, বিশ্বসংসার দুলছে। ঠাকুরের চরণ-দোলায় দুলছে নোটো গিরিশ ঘোষের জন্ম মৃত্যু, কামনা-বাসনা। আলো-আলোয় আলোময় হয়ে উঠছে পৃথিবী। চেয়ে দেখলাম, ঘুম ভেঙে হতবাক শিষ্যের দল চুপ করে চেয়ে আছে আমাদের দিকে। ঠাকুরের সর্বাঙ্গে স্বেদবিন্দু, দুই চোখে ভাব-সমাধির ঘোর। শেষ হল ভগবান রামকৃষ্ণের নর-রাস নৃত্য। চেয়ে দেখলাম, আবার আমি ফিরে এসেছি আমার সেই পুরনো প্রাচীন পৃথিবীতে—ওই গঙ্গা, ওই ভবতারিণীর মন্দিরে। ওই যে নরেন, কালি, রাখাল, তারক—তাদের চোখে নীরব ভর্ৎসনা। কানে এল—গিরিশ বাড়ী যা। জ্যোতির্ময়ী উষাকে দেখে রাতের অন্ধকার যেমন করে মুখ নীচু

করে পালায়, ঠিক তেমনি করে মেয়েগুলোকে নিয়ে নৌকোয় পালিয়ে এলাম। তখন ভোর চারটে।

বিনোদিনী ॥ (গিরিশের পায়ের ধুলো মাথায় ঠেকিয়ে) ধন্য, ধন্য আপনার পরীক্ষা, ধন্য আপনার গুরুভক্তি, আর ধন্য আপনার সাধনা! থিয়েটারের পতিতা মেয়েদের উদ্ধার করবার জন্য অসুস্থ গুরুকে দিয়ে আপনি যা করিয়েছেন, ইতিহাসে তার বুঝি কোন তুলনা নেই। বাংলাদেশের থিয়েটার যেদিন আপনাকে ভুলে যাবে—সেদিন তার মৃত্যু হবে।

গিরিশচন্দ্র ॥ কী করবো বিনোদ? পরশ-পাথর এমন একটা বস্তু সে যখন-তখন যেখানে-সেখানে তা পাওয়া যায় না। কত জন্ম ঘুরে তবে দৈবাৎ একটির খোঁজ পাওয়া যায়। এই জন্মে সেই খোঁজ পেয়েছি। তাই যেখানে যতকালের পুরনো মরচে-ধরা লোহা ছিল, সব-কিছুতেই ওই পরশমণি ঠেকিয়ে নিচ্ছি। (চুপি চুপি) যাক্ না—সব সোনা হয়ে যাক্ না! যেখানে যত ভাঙা-চোরা টুটা-ফুটা লোহা আছে—সব সোনা হয়ে যাক্। আমার মত করে বাংলাদেশের লোক যদি এই পরশমণিটিকে চিনে নিয়ে ছুঁতে পারে, তবে এই বাংলা ভবিষ্যতে সোনার বাংলা হয়ে যাবে বিনোদ!

বিনোদিনী ॥ কিন্তু তা তো হবার নয়, তা হবে না।

গিরিশচন্দ্র ॥ ঠিক বলেছ বিনোদ! তা হবার নয়, তা হবে না। কিন্তু এও তোমাকে বলে রাখছি—এই পরশমণিও আমাদের হাতে আর বেশীদিন থাকবে না। কেন জান? গিরিশ ঘোষের পাপ ওকে স্পর্শ করেছে—ও আর থাকবে না—আর থাকবে না—আর থাকবে না!

[দ্রুত প্রস্থান।

বিনোদিনী ॥ শুনুন, আপনি চলে যাবেন না—শুনুন। তিনি থাকবেন, থাকবেন, থাকবেন। যে দেবতা গিরিশ ঘোষের পাপ বহন করতে

পারেন না, তিনি কিসের দেবতা? তিনি মানুষ, অতি সাধারণ মানুষ। তাঁকে পূজো করলে দেবতার পায়ে পূজো পৌঁছবে কি না জানি না, কিন্তু মানুষের অপমান হবে। নিজের আত্মাকে ছোট করে দেবতাকে বড় করবেন না মাষ্টার মশায়—দেবতাকে বড় করবেন না! [দ্রুত প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দক্ষিণেশ্বর। ঠাকুরের ঘর।

গীতকণ্ঠে ভৈরবের প্রবেশ।

গীত।

ভৈরব ॥ কি ছার আর কেন মায়া কাঞ্চন কায়া তো রবে না,
দিন যাবে, দিন রবে না ত, কি হবে তোর তবে?
আজ পোহালে কাল কি হবে, দিন পাবি তুই কবে?
কেউ কারো নয় দেখ্ না চেয়ে, কবে ফুটবে আঁখি—
আপন রতন বেছে নে' চল, হরি বলে ডাকি।

গানের মাঝখানে রামকৃষ্ণের প্রবেশ।

রামকৃষ্ণ ॥ (গান শেষ হতে) নরেন আমার গানটা প্রায়ই গায়। দেহ-তত্ত্বের গান। বড় ভাল লেখা। গিরিশের লেখা তো! ও যা লেখে—সবই ভাল।

ভৈরব ॥ আজ ইংরিজী বছরের প্রথম দিন তাই প্রণাম করতে এলাম আর জানতে এলাম—দেহটি কেমন আছে আপনার?

রামকৃষ্ণ ॥ দেহ ? এ তো মায়ের দেওয়া ধোঁকার টাটি—থাকলেই বা কী, গেলেই বা কী ? তবে হ্যাঁ, গলাটায় বড় যন্‌তোন্না হচ্ছে। কিছু খেতে পারছি না—জানিস্ ? সে মরুকগে, তোর খবর কী বল ? অনেক দিন তোকে দেখিনি।

ভৈরব ॥ কেন, অধীনের সঙ্গে ছলনা করছো দয়াময় ? আমাকে তুমি ছাখো না বা আমার সঙ্গে তোমার দেখা হয় না—একথা কিন্তু বলতে পারবে না।

রামকৃষ্ণ ॥ তা বটে, তা বটে। পরশু রাতে ভারী আনন্দ হয়েছিল জানিস ? চারজন মাকে সঙ্গে নিয়ে রাত্তিরে গিরিশ নৌকো করে এল। রাত তখন কত হবে ? এই ধর এগারোটা বারোটা হবে। সব্বাই তখন ঘুমিয়ে পড়েছে, নেশায় টর-টর করছে গিরিশ—কী রে ! কী চাই ? না—ঠাকুর, তোমার সঙ্গে নেচে-গেয়ে আনন্দ করবো বলে এলুম। ওমা ! আনন্দ করবি তো কর না। না—তোমাকেও নাচতে হবে আমাদের সঙ্গে। বেশ তো, নাচবো, মায়েরা গান ধরলো—সেই যে বিল্বমঙ্গলের সেই গানটা রে।

ভৈরব ॥ জয় বৃন্দাবন জয় নরলীলা
জয় গোবর্দ্ধন চেতনশীলা।

রামকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ। এই তো তুইও জানিস দেখছি। আহা, কী গান ! সঙ্গে সঙ্গে উদ্দীপনা, ব্যস—আমিও মেতে গেলুম। আহা ! সে যে কী আনন্দ রে ভৈরব, জয় বৃন্দাবন জয় নরলীলা ! জয় গোবর্দ্ধন জয় চেতনশীলা ! নাচতে নাচতে দেখলাম—মা আমার চারটি সখী সেজে বৃন্দাবনের নরলীলার গান করছেন। চেতন চেতন সব চেতনাময় হয়ে উঠলো। এই মায়ের বাড়ী, ওই গঙ্গার ঘাট, ওই শিবমন্দির, ওই পঞ্চবটি—সবাই যেন ওই গান গাইছে, জয় বৃন্দাবন জয় নরলীলা ! (একটু থেমে) খুব আনন্দ হ'ল, জানিস, খুব আনন্দ !

ভৈরব ॥ ভক্তদের নিয়ে—শিষ্যদের নিয়ে তোমার খেলা তুমি খেলো ঠাকুর। আমি বিদায় নিতে এসেছি।

রামকৃষ্ণ ॥ ও! তুই আর থাকতে পারবিনে বুঝি?

ভৈরব ॥ আর কেন থাকবো—বলো? অনেকদিন আগে তোমার গিরিশকে বলেছিলাম—আমি যেদিন থাকবো না, সেদিন থেকে দেখবি তুই নিজেই ভক্ত-ভৈরব হ'য়ে গেছিস।

রামকৃষ্ণ ॥ আহা! তা বেশ, তা বেশ। মায়ের ইচ্ছেই পূর্ণ হোক। মায়ের ইচ্ছেই পূর্ণ হোক।

ভৈরব ॥ এখন থেকে গিরিশ হোক ভক্ত-ভৈরব—আবার আলাদা করে একজন ভক্ত-ভৈরবের থাকার দরকার কি?

রামকৃষ্ণ ॥ তা তুই যা ভাল বুঝিস্—তুই যা ভাল বুঝিস্। তবে কথা হচ্ছে—পথে-বিপথে হোঁচট না খায়। তুই আগলে রেখেছিলি বলে হোঁচটটা খায়নি।

ভৈরব ॥ গিরিশ হোঁচট খাবার রাস্তা পার হয়ে এসেছে ঠাকুর। তুমি করুণাময় অন্তর্যামী—তোমাকে আমি পথের কথা কি বলবো গো? বলি, দক্ষিণেশ্বরের পথ তো উঁচু-নীচু নয়। এ তো সিধে রাস্তা, আসবো বলে মনে করে বেরিয়ে পড়তে পারলেই—সটান এসে পৌঁছে যাবে।

রামকৃষ্ণ ॥ (হেসে) আর একবার এসে পড়তে পারলে তাকে আর আসতে হবে না রে—তাকে আর আসতে হবে না।

ভৈরব ॥ ও—সে কথাটাও তাহলে বলে দিলে?

রামকৃষ্ণ ॥ দিলুম বৈকি!

ভৈরব ॥ ভাল, ভাল দয়াল ঠাকুর। তাহ'লে একটা কথা বলি—এত জনকে এত দিচ্ছো, গলার ব্যথাটা মার কাছে বলে সারিয়ে নাও না।

রামকৃষ্ণ ॥ কে রে শালা! খুব বুদ্ধি দিচ্ছিস্—না? গলার ব্যথা সারিয়ে এই ব্যথার দায়ে আবার আমাকে আসতে হবে—তা জানিস্?

ভৈরব ॥ তা হবে।

রামকৃষ্ণ ॥ তবে? বারে বারে কে আসবে রে এখানে? এই নিয়ে বার বার তিনবার হ'লো। আর না, আর না। ও ব্যথা ফ্যথা যা আছে সব শোধ করে যাব।

ভৈরব ॥ লীলাময়! তাহলে এবার তোমার ব্যথার লীলা স্বরু করো। ব্যথাহারী! জগতের ব্যথা হরণ করছো, শুধু নিজের ব্যথটুকুই রাখতে চাও! তা রাখো। তোমার রাখতে ইচ্ছে হয়েছে—রাখো। শুধু আর একটা কথা বলে বিদেয় নিই। গিরিশের ওই মদটা এবার ছাড়িয়ে দাও।

রামকৃষ্ণ ॥ ওরে, হবে—হবে। সবাই মিলে তোরা ওকে মদ ছাড়াবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলি কেন? যাবে যাবে—সব যাবে, মা সব ছাড়িয়ে দেবে ওকে। কিছু বাকী রাখবে না।

ভৈরব ॥ (প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিয়ে) তাহ'লে বিদেয় হলাম।

রামকৃষ্ণ ॥ আয়, আয়—

ভৈরব ॥ (গান গেয়ে) স্বরা করিনে মা স্বধা খাই জয় কালী জয় কালী বলে। [প্রস্থান।

রামকৃষ্ণ ॥ (হা হা করে হাসতে লাগলেন। হাসতে হাসতে হঠাৎ গলার যন্ত্রণায় থেমে দু'হাত দিয়ে গলাটাকে চেপে ধরলেন।) গলায় লাগছে—মাগো! বড় কষ্ট, বড় কষ্ট!

বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ ও রাখালের প্রবেশ।

বিবেকানন্দ ॥ এই দেখ্, দেখ্লি তো? বললাম ঘরে যখন নেই, তখন নিশ্চয় পঞ্চবটিতে আছেন। আচ্ছা, আপনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন কেন?

অভেদানন্দ ॥ ডাক্তার সরকার বারবার বারণ করেছেন নড়াচড়া করতে। তবু আপনি—

রামকৃষ্ণ ॥ আরে থো কয় তোর ডাক্তার। ডাক্তার তো সব জানে!

বিবেকানন্দ ॥ মন্দিরে গিয়ে মাকে বলেছিলেন?

রামকৃষ্ণ ॥ কী বলবো?

বিবেকানন্দ ॥ যা বলতে বলেছিলাম?

রামকৃষ্ণ ॥ এই মরেছে! কী বলতে বলেছিলি মাকে?

বিবেকানন্দ ॥ বললাম না যে মাকে বলে অন্ততঃ খাবার খাবার অবস্থাটা করে নিন। রোগ নাইবা সারালেন—কিন্তু খাবার মতো অবস্থা তো করে নিতে পারেন। এই যে কিছুই খেতে পারছেন না। দুটো যাতে খেতে পারেন—তার জন্যে মাকে—

রামকৃষ্ণ ॥ বলিনি মাকে? শালা তোর জন্যে আজ কী লজ্জায় পড়তে হয়েছে আমাকে! মাকে বলে আর মুখ তুলে চাইতে পারিনে। শেষকালে পালিয়ে আসতে হ'ল।

অভেদানন্দ ॥ কেন? কী বললেন মা?

ধীরপদে রাম দত্ত ও মহেন্দ্রর প্রবেশ।

রামকৃষ্ণ ॥ আয় রাম, আয় মহিন্দর। শুনেছিস—আজ ভবতারিণীর কাছে আমাকে হাড়ির হাল করে ছেড়েছে শালা।

রাম ॥ কে করলো হাড়ির হাল?

রামকৃষ্ণ ॥ আবার কে? এই শালা নরেন। আমার কানে ফুসমন্তর দিলে—খেতে পারছেন না—মাকে গিয়ে বলুন না খাবার ব্যবস্থাটা করে দিতে।

মহেন্দ্র ॥ গেলেন বলতে?

রামকৃষ্ণ ॥ গেলুম না? গিয়ে বললুম—মা, নরেন বলছে রোগ সারাতে হবে

না—কিন্তু খেতে পারছি না, দুটো যাতে খেতে পারি—গলাটার সেরকম ব্যবস্থা করে দাও। ছি ছি ছি! কী লজ্জা! কী লজ্জা!

রাম ॥ কেন? কী হ'ল?

রামকৃষ্ণ ॥ আরে ছি ছি ছি! মা বেটি তো শুনে হেসেই খুন। বললে—হ্যাঁরে, এই যে পিরথিমী, লক্ষ লক্ষ লোকের গলা দিয়ে খাচ্ছিস, তাতেও তোর খিদে মিটলো না! খাওয়া মাথায় থাক, পালিয়ে আসতে পথ পাইনে। এই নরেনের জন্যেই বেইজ্জতি হল আমার। ওই ছ্যাখো, রাখালে কাঁদতে আরম্ভ করলে। ও গোপাল, এদিকে আয়। ওরে, আমার কাছে আয়! (কাছে ডেকে নিয়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে) কাঁদছিস্ কেন? কী হয়েছে?

রাখাল ॥ মা এমন শত্রুতা করলেন আপনার সঙ্গে?

রামকৃষ্ণ ॥ দূর পাগ্‌লা! মা কি কখনো শত্রুতা করতে পারে ছেলের সঙ্গে! কক্ষনো এ ধারণা মনে রাখিসনি। মা করুণাময়ী। তাঁর করুণার কী অন্ত আছে রে? অন্ত নেই, অন্ত নেই।

রাখাল ॥ তাহলে খাবার ব্যবস্থা করে দিলেন না কেন?

রামকৃষ্ণ ॥ খাবার ব্যবস্থা করে দিলে—মাকে যে আবার অন্যভাবে বন্দোবস্ত করতে হয় রে পাগলা। গলায় ঘা দিয়ে একরকম করে ভেবে রেখেছে। এখন আমি যদি খেতে পাবার জন্যে হ্যাংলাপনা সুরু করি, তখন আবার অন্যভাবে ভাবতে হবে।

[মহেন্দ্র নোটবুকে একমনে কি লিখে যাচ্ছেন।]

রাখাল ॥ কী অন্যভাবে ভাবতে হবে? খেতেই যদি দেবেন না, তবে মা হয়েছেন কেন?

রামকৃষ্ণ ॥ ও রাম, আমার গোপাল কী রকম ঠোঁট ফোলাচ্ছে একবার ছ্যাখ। ছেলেমানুষ তো! আচ্ছা, তোকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ধর-না ক্যানে—

রেলগাড়ী ধরে বাড়ী যাবে বলে মা ছেলেকে নিয়ে পোঁটলা-পুঁটলী বেঁধে ইষ্টিশানে এসে বসে আছে—উঁ! গাড়ী আসবার সময় হয়েছে, টিকিট কাটা হয়ে গেছে, ইষ্টিশান মাষ্টারও লাইন কিলিয়ার দিয়ে দিয়েছে। ব্যস, এমন সময় ছেলে বায়না ধরলে—আমার বড্ড খিদে পেয়েছে, কিছু না খেয়ে আমি গাড়ীতে উঠবো না।

রাম ॥ জয় গুরু! জয় গুরু!

রাখাল ॥ খিদে পেলে কি ছেলে বলবে না?

রামকৃষ্ণ ॥ বলবে বলবে, কিন্তু তার তো সময় অসময় আছে। ছেলের বায়না শুনে মা আবার পোঁটলা-পুঁটলী খুলে আদ্দেরে ছেলেকে গেলাতে বসলো—আর চোখের সামনে দিয়ে হুস হুস করে গাড়ীটা চলে গেল।

রাখাল ॥ তাহলে কী হবে?

রামকৃষ্ণ ॥ কী আবার হবে? বিদেশ-বিভুঁই—আবার কখন গাড়ী আসবে কে জানে! মা রাগ করবে।

অভেদানন্দ ॥ নিয়ে যাবার যখন অত তাড়া তখন বিদেশে ছেলেকে পাঠানোই বা কেন?

রামকৃষ্ণ ॥ আরে বাপু, মুখ্যু ছেলেকে মা শিখতে পাঠিয়েছিল।

বিবেকানন্দ ॥ তাহলে সেই কথাটা বলুন না স্পষ্ট করে। সেই মনের কথাটাই আমাদের বলে দিন—আমরা অন্ততঃ কিছুটা তৈরী থাকি। যখনই শুনেছি গলায় ঘা—তখনই তো জানি, নতুন করে বলার কী আছে আর? [দ্রুত প্রস্থান।

রামকৃষ্ণ ॥ বাবুর রাগ হয়ে গেল। হ্যাঁ রাম ও মহিন্দর—বলি, আমি কি অন্যায় কিছু বলেছি? এ বোঝা আর কতকাল টানবো!

গীত

এবার ভালয় ভালয় বিদায় দে মা,
আলোয় আলোয় চলে যাই।...

ও, ভাল কথা। তোদের আর একটা কথা বলে দিই। তোরা জানিস তো নরেনের শিব-অংশে জন্ম। ও সাক্ষাৎ শিব। যেদিন ও নিজেকে চিনতে পারবে, সেইদিনই দেহ ছেড়ে দেবে। তোরা যেন ভুলেও কোনদিন একথা ওর সামনে তুলিসনে। আচ্ছা, আজ ইংরেজী বছরের পেরথম দিন,—গিরিশ এখনো এল না কেন ?

রাম ॥ কাল অনেক রাত্তির অবধি তার থিয়েটার গেছে তাই আসতে দেরী হচ্ছে। আমাকে বলেছিল সকালেই আসবে।

রামকৃষ্ণ ॥ আচ্ছা, আচ্ছা, মহিন্দর—তুই এখনোও সেই জমা-খরচের হিসেব করছিস ?

মহেন্দ্র ॥ না প্রভু! এটা খরচের খাতা নয়, জমা—শুধু জমা করে যাচ্ছি।

রামকৃষ্ণ ॥ তা ভাল, তা ভাল। মা তো কতো কথাই বললে—সে সবই নেকা রইল আমার মহিন্দরের খাতায়। হয়তো কত লোকের কত কাজ হবে ওই নেকা দিয়ে। রাখালে, ঘরে যা। আজ যেন বড্ড শীত পড়েছে। কালি, তুইও যা। [নিঃশব্দে রাখালের প্রস্থান।

অভেদানন্দ ॥ কিন্তু এখানে এই খোলা জায়গায় আপনি বেশীক্ষণ বসে থাকবেন না। আপনিও ঘরে চলুন।

রামকৃষ্ণ ॥ যাচ্ছি, যাচ্ছি—তুই যা না।

রাম ॥ কালি, আমরা তো আছি ঠাকুরের কাছে। উনি যেতে বলছেন যখন যাও। (ইংগিতে অভেদানন্দকে যেতে বললেন)

অভেদানন্দ ॥ রাম দাদা— [ধীরে ধীরে প্রস্থান।

রামকৃষ্ণ ॥ মহীন্দর কী লিখেছিস একটু পড়ে শোনা দিকি।

আবৃত্তি করতে করতে গিরিশচন্দ্রের প্রবেশ।

গিরিশচন্দ্র ॥ শুন শুন বিশ্ববাসী, শুন সর্বজন—
এসেছে দক্ষিণেশ্বরে দরিদ্র ব্রাহ্মণ।

মাতৃশক্তি পরিপুষ্ট রামকৃষ্ণ নাম—
পরশ করিলে তার পূর্ণ মনস্কাম।
জপ মন নিরন্তর রামকৃষ্ণ নাম—
চলো সেই তীর্থে যেথা রামকৃষ্ণ ধাম।
জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ!

রামকৃষ্ণ॥ আয় গিরিশ, আয়। আমি একটু আগেই বলছিলুম যে আজকে ইংরেজী বছরের পেরথম দিন,—গিরিশ এখনো আসছে না কেন?

গিরিশচন্দ্র॥ তোমার আমার মাঝখানের সুতোটাতে এতই গিঁট ফেলেছ গুরু, যে, সেই গিঁট খুলতে খুলতে আসতে দেরী হয়ে যায়। গলার ব্যথা কেমন?

রাম॥ ব্যথা বেড়েছে।

মহেন্দ্র॥ Practically কিছুই খেতে পারছেন না।

গিরিশচন্দ্র॥ হবে না? আরো গিরিশ ঘোষের বকল্‌মো নাও, তুমি জেনে-শুনে কেন একাজ করলে? তুমি তো জানতে প্রভু, যে, গিরিশ ঘোষের পর্বতপ্রমাণ পাপ, এত পাপ কেউ নিতে পারবে না—নেওয়া যায় না। স্বয়ং বিধাতাও এত পাপ দেখে ভয় পান।

রামকৃষ্ণ॥ কী বকছিস্ রে?

গিরিশচন্দ্র॥ বকি সাধে? কেন তুমি সাধ করে এই হতভাগাকে পাপমুক্ত করবার জন্য এই পাপ ধারণ করলে? ওগো, এ তো পাপ নয়—এ যে বিষ। সুতীব্র হলাহল। স্বর্গের মহেশ্বর সাগরমন্থনের বিষ কণ্ঠে ধারণ করেছিলেন, আর তুমি মর্ত্যের মহাদেব, গিরিশের জীবন-মন্থনের বিষ ধারণ করে নীলকণ্ঠ হলে। এই গুরুহত্যার গুরু অপরাধ আমি রাখবো কোথায়?

রামকৃষ্ণ॥ জয় মা! জয় মা!

মহেন্দ্র॥ গিরিশবাবু, শান্ত হ'ন—শান্ত হ'ন।

রাম ॥ আপনাকে অস্থির হতে দেখলে ঠাকুর নিজে অস্থির হয়ে পড়বেন।

গিরিশচন্দ্র ॥ কে কাকে অস্থির করবে রাম, চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছি —আপন গুরুর গলা টিপে ধরেছে গিরিশ ঘোষ। বাকী ছিল গুরু-হত্যা। এবার সেই পুণ্য কাজটিও সে করবে। বলি, তুমি তো সর্বশক্তিমান! মানুষের মঙ্গলের জন্যে বারে বারে আসা-যাওয়া করছো। কিন্তু বুকে হাত দিয়ে বল দেখি, সৃষ্টির সুরু থেকে ক'টা পাপীকে আজ অবধি উদ্ধার করতে পেরেছ? না হয়—নাই হ'তো গিরিশ ঘোষের উদ্ধার! কিন্তু তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে এই দুরন্ত রোগকে কেন তুমি ডেকে নিয়ে এলে নিজের গলায়?

রামকৃষ্ণ ॥ শুনলি রাম, শুনলি মহিন্দর, এ ব্যাটার কথা? ওর পাপকে আমি নাকি গলায় ধারণ করেছি। কী সব বুদ্ধি! আর যদি তাই করেই থাকি—তাতে তোর কী?

গিরিশচন্দ্র ॥ তাই বটে, আমার কী-ই বটে!

রামকৃষ্ণ ॥ ও, ভাল কথা! হ্যাঁরে, তুই নাকি চারদিকে গাবিয়ে বেড়াচ্ছিস যে—আমি মহাত্মা, আমি মহাপুরুষ, আমি ভগবান?

গিরিশচন্দ্র ॥ কে বললে?

রামকৃষ্ণ ॥ ক্যানে? নরেন শুনে এসেছে, রাম শুনেছে—সবাই বলছে। তুই কি আমায় দয়ে মজাবি? এসব কথা বলে বেড়াচ্ছিস কেন?

গিরিশচন্দ্র ॥ তাহলে একটা কথা বলি তোমাকে। প্রভু ব্যাস—বাল্মীকি যাঁর কথা লিখে শেষ করতে পারলেন না—নারদ যাঁর মহিমা কীর্তনের গান গেয়ে—যাঁর অন্ত করতে পারলেন না—আমি কীটস্য কীট, তাঁর কথা কী বলবো, আর কতটুকুই বা বলবো?

[ঠাকুরের মধ্যে ভাব-সমাধির পূর্ব-লক্ষণ দেখা গেল। তিনি একটু একটু কাঁপতে লাগলেন—আর মাঝে মাঝে 'জয় মা' 'জয় মা' বলতে লাগলেন।]

গিরিশচন্দ্র ॥ আমার মুখ দিয়ে যা বলাতে চেয়েছ, তাই বলেছি। আমি যন্ত্র,

তুমি যন্ত্রী—যে সুরে বাজাতে চেয়েছ, সেই সুরে বেজেছি। এর মধ্যে আমার হাত তো কিছু নেই প্রভু!

রাম ॥ (গিরিশের গায়ে হাত দিয়ে তাঁকে সতর্ক করে) বোধহয় নিজের অজান্তে তুমি ঠাকুরের ক্ষতি করলে গিরিশ-ভাই। ওই ছাখো, ঠাকুরের ভাব-সমাধির লক্ষণ ফুটে উঠেছে।

রামকৃষ্ণ ॥ (উঠে দাঁড়ালেন। জড়িয়ে জড়িয়ে—) তবে তাই হোক, তাই হোক! তোদের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক! যে রাম, সেই কৃষ্ণ—ইদানীং সেই রামকৃষ্ণ। চেয়ে নে, ওরে, চেয়ে নে—আজ যার যা মনের বাসনা সব চেয়ে নে আমার কাছে। আজ আমি কল্পতরু হয়েছি! তোরা যা চাইবি—সব দেব আজ। আমি কল্পতরু আজ।

রামকৃষ্ণ ॥ (চলে যেতে যেতে) রাম!

রাম ॥ আজ্ঞে?

রামকৃষ্ণ ॥ চা, চেয়ে নে—কী চাই?

রাম ॥ মোক্ষ।

রামকৃষ্ণ ॥ তথাস্তু! মহিন্দর, চা—

মহেন্দ্র ॥ পৃথিবীতে যেন আসতে না হয় প্রভু।

রামকৃষ্ণ ॥ তথাস্তু! [প্রস্থান।

গিরিশচন্দ্র ॥ জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ! পরিষ্কার ভাবের ঘোরে বলে দিলেন—যে রাম, সেই কৃষ্ণ, ইদানীং সেই রামকৃষ্ণ। পরিষ্কার! পরিষ্কার হয়ে গেল আজ! ওরে গিরিশ ঘোষ, তোর আজকের সৌভাগ্য, আজকের আনন্দের কেউ সাক্ষী রইলো না রে! আজ কীটাণুকীট নোটো গিরিশ ঘোষের কথায় স্বয়ং পুরুষোত্তম কল্পতরু হয়ে গেলেন। জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ! গুষ্টিশুদ্ধ সবাই মুক্ত-কচ্ছ হয়ে মোক্ষ চাইছে। নরেন, কালি, রাখাল—সবাই ওঁর কল্পতরুর কাছে মোক্ষ চাইবে। মোক্ষ, মোক্ষ। পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। কী মুখ্যু রে এরা!

ওগো ঠাকুর, এবার পৃথিবীতে এসে তোমাকে দেখলুম, তোমার শ্রীমুখের কথা শুনলুম, তোমাকে স্পর্শ করলুম,—মোক্ষ আমাকে চেয়ে নিতে হবে কেন? আমার মোক্ষ আটকায় কোন্ শুয়োরের বাচ্চা? হ্যাঁ হ্যাঁ, কোন্ শালা আমার মোক্ষ আটকাচ্ছে শুনি?

[উন্মাদের মত দ্রুত প্রস্থান। তৎপশ্চাতে অন্যান্য সকলের প্রস্থান।

শেষ দৃশ্য

দক্ষিণেশ্বর মন্দির।

(নেপথ্যে লোকজনের গোলমাল।)

জীবন ও জুড়নের দ্রুত প্রবেশ।

জীবন ॥ খবরটা পেতে অনেক দেরী হয়ে গেছে। থিয়েটারশুদ্ধ লোক বর চেয়ে নিয়ে যাবার পর—খবরটা পেলাম।

জুড়ন ॥ শুনলাম ঠাকুর সূর্যাস্ত পর্যন্ত কল্পতরু থাকবেন। তা সূয্যি ডুবতে এখনো আধঘণ্টাটাক দেরী আছে। কি চাইবি রে জীবনে?

জীবন ॥ অভিনেতা হিসেবে খ্যাতি, যশ।

জুড়ন ॥ আমি ভাই, টাকা চাইব। টাকার বড্ড দরকার আমার।

জীবন ॥ এখন এই বিরাট ভীড় ঠেলে এগোনোই তো মুস্কিল। হয়তো আমরাও পৌঁছবো—আর সূয্যিও ডুবে যাবে।

জুড়ন ॥ হতে পারে। আমাদের কপাল তো! গিরিশবাবু কোথায়?

জীবন ॥ তিনি—শুনলাম, সকাল থেকে গুরুভাইদের সঙ্গেই আছেন। খাওয়া-দাওয়াও হয়নি। খুব মেতে আছেন শুনলাম।

জুড়ন ॥ আরে, চল্—চল্! গেল যে সূয্যি ডুবে!　　[উভয়ের প্রস্থান।

বিনোদিনীর প্রবেশ।

বিনোদিনী ॥ ভগবান কল্পতরু হয়েছেন—খবর শুনে ছুটে এলাম। থিয়েটার থেকে সবাই এসেছিল। কেউ ধর্ম, কেউ অর্থ, কেউ কাম, কেউ মোক্ষ চেয়ে নিয়ে গেল। আমি কি কিছু চাইব? না, আমার কিছু চাইবার নেই। আমি একটু দেখবো। সেই নয়নানন্দ রামকৃষ্ণকে একটু দর্শন করবো। তারপর দূর থেকে প্রণাম করে চলে যাবো।

গিরিশচন্দ্রের প্রবেশ।

গিরিশচন্দ্র ॥ একি, বিনোদ! তুমি কখন এলে?

বিনোদিনী ॥ একটু আগে।

গিরিশচন্দ্র ॥ ঠাকুরকে দর্শন করেছ?

বিনোদিনী ॥ না।

গিরিশচন্দ্র ॥ যাও, দর্শন করে এসো। অভূতপূর্ব কাণ্ড হয়েছে আজ বিনোদ। সকালে ঠাকুর কল্পতরু হয়েছেন। কিন্তু কেমন করে যে এই খবর আগুনের মত রটে গেল আর দেখতে দেখতে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের এই বিরাট জায়গা লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল, আমি তাই বুঝতে পারছি না।

বিনোদিনী ॥ এখনো তো লোক আসছে?

গিরিশচন্দ্র ॥ হ্যাঁ, ঘাটে আর নৌকো রাখবার জায়গা নেই। ঘোড়ার গাড়ীতে গাড়ীতে মানুষের চলাচলের পথ আটকে গেছে বিনোদ। ঠাকুর আজ প্রকট হয়েছেন। এই পয়লা জানুয়ারী ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে চিহ্নিত হয়ে রইলো। পঞ্চাশ একশো বছর পরে হয়তো এই দক্ষিণেশ্বর তীর্থ হয়ে উঠবে! প্রত্যেক পয়লা জানুয়ারীতে

দলে দলে মানুষ আসবে আর ঠাকুরের বিদেহী আত্মার কাছে বর চাইবে।

বিনোদিনী ॥ তুমি কি চাইলে ?

গিরিশচন্দ্র ॥ আমি ? কিছু না বিনোদ। না চাইতেই যেখানে আমার জীবনের পাত্র পূর্ণ করে দিয়েছেন সেখানে নতুন করে কি চাইবো বলো তো ?

বিনোদিনী ॥ তাহলে আমারও কিছু চাইবার নেই।

গিরিশচন্দ্র ॥ নাই বা চাইলে ! যাও, তাঁকে দর্শন করে এসো।

বিনোদিনী ॥ না। তাও আমার দরকার নেই। (হেঁট হয়ে গিরিশচন্দ্রের পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় দিলেন) আজ এই দক্ষিণেশ্বরে এসে তোমার মধ্য দিয়েই আমি আমার প্রাণের ঠাকুরকে দর্শন ও স্পর্শ করে গেলাম। তুমিই আমার তীর্থ, তুমিই আমার ঈশ্বর ! আমি জানি, তোমার মধ্যে দিয়েই ঠাকুর আমার প্রণাম গ্রহণ করলেন।

[প্রস্থান।

গিরিশচন্দ্র ॥ ধন্য বিনোদিনী ! ধন্য ! তোমার এই বিশ্বাসের এক কণাও যদি আমি পেতাম ! বিনোদ, আজ বুঝলাম—কেন তুমি এত কাছে থেকেও এত দূরে। কি জানি, এমনি করেই বুঝি সব দিয়ে সব পেতে হয় ! [প্রস্থান।

[নেপথ্যে গোলমাল বাড়ছে। 'রামকৃষ্ণ কি জয়' ইত্যাদি ধ্বনি শোনা যাচ্ছে।]

রাম দত্ত ও বিবেকানন্দের দ্রুত প্রবেশ।

বিবেকানন্দ ॥ সূর্য অস্ত গেছে। ঠাকুর কল্পতরু প্রত্যাহার করেছেন। কিন্তু—

রাম ॥ লোকজনও তো সব চলে যাচ্ছে ?

বিবেকানন্দ ॥ তা যাচ্ছে। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে, ঠাকুরের ঘরে তো ঢোকা যাচ্ছে না। যে ঢোকবার চেষ্টা করছে—সে-ই ভয় পেয়ে ছিটকে বেরিয়ে আসছে। গুরু তো ভাবে টইটম্বুর হয়ে বসে আছেন।

রাম ॥ ঠিকই বলেছ নরেন। আমি ঢোকবার চেষ্টা করেছিলাম। ঠিক মনে হল, কে যেন আমাকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ঘরের বাইরে বার করে দিলে।

বিবেকানন্দ ॥ খুব বিপদ হলো দেখছি। সারাদিন কল্পতরু হয়ে কেবল 'তথাস্তু' বলেছেন। এখন একটু দুধ মিষ্টি ওঁকে না খাওয়াতে পারলে তো সর্বনাশ হবে।

রাম ॥ আশ্চর্য! কী হল ঘরটার মধ্যে? কেউ ঢুকতে পারছে না! থমথম করছে ঘরটা।

বিবেকানন্দ ॥ শুধু ঘরই নয় রাম দাদা। ঠাকুরের মূর্তিও অন্যরকম হয়েছে। এ যেন আমাদের সেই সদাহাস্যময় গুরু নয়—অন্য কেউ।

রাম ॥ গিরিশ আছে— না?

বিবেকানন্দ ॥ হ্যাঁ, আছে। জি. সি. এইমাত্র বিনোদিনীকে গাড়ীতে তুলে দিতে গেল।

আবৃত্তি করতে করতে গিরিশচন্দ্রের প্রবেশ।

গিরিশচন্দ্র ॥
তিরস্কার পুরস্কার করেছি কণ্ঠের হার
তথাপি এ-পথে পদ করেছি অর্পণ,
বঙ্গভূমি ভালবাসি, হৃদে সাধ রাশি রাশি
আশার নেশায় করি জীবন যাপন।

কি গো! কি ব্যাপার?

বিবেকানন্দ ॥ জি. সি., সর্বনাশ হয়েছে!

গিরিশচন্দ্র ॥ কি হল আবার?

বিবেকানন্দ ॥ ঠাকুরের ঘরে ঢোকা যাচ্ছে না।

গিরিশচন্দ্র ॥ কেন ?

বিবেকানন্দ ॥ এত চার্জড্ হয়ে আছে ঘরটা, আমি গিয়ে ঢুকতে গিয়ে ভয় পেয়ে পালিয়ে এলাম। কী একটা অজানা ভয়—আমি ফেস্ করতে পারলাম না।

রাম ॥ আমিও ঘরে ঢুকেছিলাম। ঠিক মনে হল, কে যেন আমাকে ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বার করে দিলে।

বিবেকানন্দ ॥ মহেন্দ্রবাবু পারেননি। নাগমশায় এসেছেন আজ, তিনিও পারেননি। তারক, কালি, রাখাল—সবাই ভয় পেয়ে পালিয়ে এসেছে। (গিরিশচন্দ্র ভাবছেন) কি করা যায় জি. সি. ? গুরুকে একটু ফল দুধ খাওয়াতে না পারলে হয়তো রাত্রেই দেহ ছেড়ে দেবেন।

গিরিশচন্দ্র ॥ নরেন, কালি কোথায় ? তাকে শীগগির তিনটে অর্ঘ্য তৈরী করতে বলো।

রাম ॥ অর্ঘ্য ?

গিরিশচন্দ্র ॥ বেলপাতা, জবাফুল, রক্তচন্দন—আরে বাবা, যা যা লাগে অর্ঘ্যে !

বিবেকানন্দ ॥ আমি এক্ষুনি রেডী করছি। কিন্তু তুমি এসো ঠাকুরের ঘরের কাছে। আসুন রাম দাদা। [রামদত্তসহ প্রস্থান।

গিরিশচন্দ্র ॥ গুরু! যদি ভুল বুঝে না থাকি, তাহলে যা ভাবছি তাই হয়েছে। ঠিক আছে গুরু। এস—আর একবার পাঞ্জা লড়ি, আর একবার। আর বোধকরি—বোধকরি এই শেষবার। এই শেষবার— [প্রস্থান।

ভাবাবেশে আচ্ছন্ন হয়ে রামকৃষ্ণের প্রবেশ।

[অল্প অল্প টলছেন তিনি। দূরে সমবেত কণ্ঠে গান শোনা যাচ্ছে—"খণ্ডন ভব বন্ধন" ।]

গিরিশচন্দ্রের প্রবেশ এবং পশ্চাতে তিনটি অর্ঘ্য
হাতে নরেন, কালি ও রাখালের প্রবেশ।

গিরিশচন্দ্র॥ (দাঁড়ালেন, একটু দেখলেন, তারপর—) মৎসনো পাতকী নাস্তি, পাতঘ্নী তৎসমা নাহি এবং জ্ঞাত্বা মহাদেবি যথাযোগ্যং তথা কুরু। মাগো, আমার মত পাতকীও যেমন নাই, তেমনি তোমার মতো পাতঘ্নীও তো নাই। হে মহাদেবি, এই বুঝে যা যোগ্য বিবেচনা করো—তাই করো। (এগিয়ে এসে) ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে শরণ্যেত্রম্ব্যকে গৌরী নারায়ণী নমোস্তুতে। মা ভবতারিণী! বুঝেছি, আমাদের গুরুকে আচ্ছন্ন করে আজ তুমি প্রকট হয়েছ। (হাত জোড় করে) আমাদের সকলের অপরাধ তুমি ক্ষমা করো। ক্ষন্তব্যো মেপরাধঃ প্রকটিত বদনে কামরূপে করালে। (বিবেকানন্দের হাত থেকে অর্ঘ্য নিয়ে—) ইদমর্ঘ্যং ওঁ হ্রীং কালিকায়ৈ নমঃ।

[ঠাকুরের পেছনে ঝলসে উঠলো কালীমূর্তি।]

গিরিশচন্দ্র॥ (কালির কাছ থেকে অর্ঘ্য নিয়ে—) ইদমর্ঘ্যং ওঁ হ্রীং কালিকায়ৈ নমঃ।

[আবার কালীমূর্তি ঝলসে উঠলো]

গিরিশচন্দ্র॥ (রাখালের কাছ থেকে অর্ঘ্য নিয়ে—) ইদমর্ঘ্যং ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায় নমঃ।

[গান বাড়তে লাগলো। ঠাকুর 'জয় মা' 'জয় মা' বলতে লগলেন। গিরিশচন্দ্র উন্মাদের মতো 'ওঁ ভগবতে রামকৃষ্ণায় নমঃ' বলছেন আর নাচছেন। বিবেকানন্দ ঠাকুরকে এবং কালি ও রাখাল গিরিশচন্দ্রকে ভেতরে ধরে নিয়ে গেল। গান তখনো চলছে: খণ্ডন ভব বন্ধন···]

॥ **যবনিকা** ॥